বেঙ্গল টাইমস

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

গল্পের সরণি

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

গল্পের সরণি

বাঙালির জীবনে আড্ডা আছে। বেড়ানো আছে। খেলা আছে, সিনেমা আছে। তেমনই গল্পও আছে। গল্প ছাড়া বাঙালি হয়!

বেঙ্গল টাইমসের সাহিত্য বিভাগকে মাঝে মাঝেই সক্রিয় করার চেষ্টা হয়েছে। ভাল কিছু গল্প, উপন্যাস, অনু গল্প, রম্য রচনা নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগই পুজো সংখ্যা বা দীপাবলি সংখ্যায়। পাঠকেরা মাঝে মাঝেই অভিযোগ করেন, নিয়মিত সংখ্যায় সাহিত্য কিছুটা যেন উপেক্ষিত। একটা বা দুটো সাহিত্যধর্মী ফিচার থাকে। একটা বা দুটো গল্পও থাকে। অভিযোগটা অনেকাংশেই সত্যি। আসলে, ঘটনাবহুল সময়ে রাজনীতি, খেলা, বিনোদন এসবকে তো সরিয়ে রাখা যায় না। তার ওপর ভ্রমণ, স্পেশ্যাল ফিচার

তো থাকেই। এরপর সাহিত্যের জন্য বাড়তি দশ-বারো পাতা যোগ করতে গেলে অনেক সময় কলেবর বেড়ে যায়।

বিভিন্ন পত্রিকা মাঝে মাঝেই গল্প সংখ্যা প্রকাশ করে। বেঙ্গল টাইমস কি গল্প সংখ্যা প্রকাশ করতে পারে না! আলবাত পারে। তাতে হয়তো নামী লেখকদের নামের ভীড় থাকবে না। কিন্তু গল্পের আমেজ তো থাকবে। বেঙ্গল টাইমসের যাঁরা নিয়মিত লেখক, তাঁদেরই কিছু গল্প নিয়ে এবারের সংকলন। বিশেষ ভৌতিক গল্প, প্রেমের গল্প, পুজোর গল্প, কিশোর গল্প— এমন তকমা এঁটে নয়। চেষ্টা করা হয়েছে নানা স্বাদের গল্পকে দুই মলাটের মধ্যে আনার। গল্পের সরণিতে আপনার যাত্রা শুরু হোক।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক,
বেঙ্গল টাইমস

অ-আ-ক-খ

কুণাল দাশগুপ্ত

জীবনের যত কোলাহল সব অ্যালকোহলেই খুঁজে পেত সবুজ। কাব্য করে বলত, কত সন্ধ্যা রঙিন হয় লাল রঙের এই জলে, কত গ্লাসের গায়ে জমে কত আবেগের বিন্দু।

এই বিলাসিতাকে এক ইঞ্চিও প্রশ্রয় দিতে চায়নি তার চাকরিরতা স্ত্রী অনসূয়া। অশান্তির বর্ষা অমঙ্গল ডেকে আনত প্রতি রাতে। নিয়ম করে।

দূরত্ব ছিল আরও একটা বিষয়েও। রাজনীতি। সবুজের বাম বিরোধিতা ছিল অকৃত্রিম। সর্বহারা, শ্রেণিহীন সমাজ জাতীয় শব্দগুলো গা জ্বলিয়ে দিত তার। উল্টোদিকে অনসূয়া বাম কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মিটিং, মিছিল তার কাছে সঙ্গীতশিল্পীর গলা সাধার মতো নিত্য দিনের কাজ।

অশান্তি, ঝগড়ার অন্তাক্ষরী চলার সময়ে কখনও কখনও অনসূয়ার অ–আ–ক–খ সিরিজের বাম বইগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে। অশালীন শব্দ প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রের অসারতার কথাও বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে চৌত্রিশ বছরের বাম রাজত্ব রাজ্যকে

সাড়ে বত্রিশভাজা করেছে। অনসূয়াও বলেছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ক্ষুদ্র শিল্প, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত, কৃষিতে এই রাজ্যটাই এগিয়েছিল। আসলে, বাম বিরোধিতা করতে গেলে লেখাপড়া না করলেও চলে। কিন্তু সমর্থন করতে গেলে একটু আধটু পড়তে হয়। তোমার বিজ্ঞান জ্যোতিষ আর জড়িবুটি। আমার বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

সবুজ লম্বা। ছিপছিপে। বেসরকারি কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগের জিএম। বৈভবের চিলেকোঠায় বসে রয়েছে।

আরও একটা গুন রয়েছে। মেয়েদের মনকে প্রভাবিত করতে পারে 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপের মতোই। সুতপার মনে হানাদারি চালিয়েছে একেবারে এক্কেবারে সবুজীয় কায়দায়। শরীর-মন দুটোই মাখামাখি করেছে দুজনে। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলগুলো প্রতি সন্ধ্যায় সত্যযুগের বৃন্দাবন হয়ে যেত। প্রাচ্যের আরব্য রজনী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অন্যদিকে, অনসূয়া মন দিয়েছিল রাজনীতি আর তাদের দশ বছরের ছেলে অনীকের লেখা পড়ার বিষয়ে। আসলে, কাটখোট্টা রাজনীতির পাশাপাশি সংসারে শান্তির ফুল ফোটানোরও একটা স্বপ্ন ছিল তার। অফিস, রাজনীতি আর ছেলে মানুষ করাই ছিল অনসূয়ার জীবনের সিম্ফনি।

সুর ছিটকালো, যখন জানতে পারল

সবুজ-সুতপার ব্যকরণ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা। সেদিনই হৃদয়ের ঝাঁপ ফেলে দেয় সে। তারপর একদিন সরকারি তালা। ডিভোর্স হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে পচন ধরে সবুজ-সুতপার কৃত্রিম প্রেমে। সবুজও বুঝতে পারে, বউ আর 'বউয়ের মতো'র মধ্যেকার ফারাকটা।

অতিরিক্ত মদের ফলে বিবর্ণ হয়েগিয়েছিল সবুজের স্নায়ুগুচ্ছ। অবসাদ আর অপরাধবোধ পিশাচের নৃত্য চালিয়ে যায় মনের মধ্যে। বুঝতে পারে সর্বহারা কাকে বলে।

বড্ড মনে পড়েছে অনসূয়ার কথা। অতঃপর কড়া নাড়ে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া শ্বশুরবাড়ির দড়জায়। শীর্ণকায় সবুজ অনসূয়াকে বলে, শেখাবে একটু বাম রাজনীতির অ-আ-ক-খ?

বেঙ্গল টাইমস

গল্প

জাতিস্মর

ডা. অভীক কুমার জানা

জাতিস্মর কথাটা আজকাল সাধারণ মানুষ প্রায় ভুলতেই বসেছে। তা হবে নাই বা কেন। আগে তবু মাঝেমধ্যে যাও বা শোনা যেত, ইদানিং তো আর কানেই আসেনা। তাহলে কি পূর্বজন্মের স্মৃতি মানুষের আর থাকছে না?

আসলে রিপোর্টার সায়নের মাথায় এইসব চিন্তাগুলো ঘুরঘুর করার একটা নির্দিষ্ট কারণ ছিল। সায়ন বাংলা সংবাদপত্র 'খবর বাংলা'-তে কাজ করে। প্রায় বছর পাঁচেক হল তার এই কাগজে। কিন্তু শুরুতে যেভাবে সে স্বপ্ন দেখেছিল সেরকম উন্নতি তার কর্মক্ষেত্রে ঘটেনি। কিন্তু সায়নই বা কী করবে? প্রত্যেক নামজাদা রিপোর্টারের জীবনে লাগে একটা হইচই ফেলে দেওয়ার মতো খবর। যাকে বলে স্কুপ। কিন্তু সায়নের দুর্ভাগ্য যে তার জীবনে এরকম সুযোগ একটাও আসেনি। সেই একই গড়পড়তা কাজ আর রুটিন মাফিক বস্তাপচা খবরের রিপোর্টিং। তার মনেপ্রাণে প্রচণ্ড উচ্চাশা ছিল 'খবর বাংলা' ছেড়ে আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত কোনও কাগজে সুযোগ পাওয়া। দরকার ছিল শুধু ওই একটা স্কুপের।

তাই ভগবানও যেন তার অদম্য ইচ্ছার খবর পেয়ে তার কোলে এই সুযোগটা তুলে দিলেন। সায়ন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার খবরটা দেখে। খবরের কাগজে তার ফোন নাম্বারটাও দেওয়া থাকে। আর সেটা দেখেই ফোনটা আসে। বারুইপুরের ভেতরে নিমতলা বলে একটা জায়গা থেকে। সায়ন তখন বিরক্ত হয়ে অফিসে বসে আঙুল মটকাচ্ছিল।

-"আচ্ছা, আপনি সায়নবাবু তো? খবর বাংলা?"

-"বলছি।'

-"আমি নিমতলা থেকে শ্যামল বাবু বলছি। আপনাকে একটা খবর দেওয়ার জন্য ফোন করলাম।"

-"কী খবর, ছিনতাই, মারপিট, চুরি, পলিটিক্স না রেপ?", বিরসবদনে নোটবইটা টেনে নিয়ে সায়ন বলল।

-"না স্যার, ওগুলোর কোনওটাই নয়। আসলে ব্যাপারটা হল গিয়ে ওই যাকে বলে জাতিস্মর। মানে পূর্বজন্মের কথা মনে থাকলে যাকে বলে আরকি।"

সায়ন বেশ নড়েচড়ে বসল। ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং তো! ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তো দারুণ কাটবে। একদম অন্য ধরণের খবর। একদম হইচই ফেলে দেওয়া।

-"তা দাদা আপনি কে? যার কথা বললেন সে আপনার কে হয়? সব খুলে বলুন।"

-"দেখুন স্যার, আমাদের পাড়াতে একটা পাঁচ বছরের ছেলে আছে। সে আজব আজব সব কথা বলে। আমি ওদের দুটো বাড়ি পরেই থাকি। কপাল এমন, আমার ছেলেটা আবার ওর সঙ্গে খুব মেশে। ভয় হচ্ছে, আমার ছেলেটাও না বিগড়ে যায়।"

-"কী বলে?", চাপা উত্তেজনায় সায়ন জিজ্ঞেস করল।

-"ও বাবা, বিদঘুটে সব কথা! সে নাকি কোন এক মহারাজা ছিল, সেসব কাহিনী। ওই সেই সোনার

কেল্লা সিনেমার মুকুলের মতন।"

-"তা আমি কী করতে পারি?"

-"না স্যার, তেমন কিছু না। আপনি যদি খবরটা করেন তাহলে অনেকে জানতে পারবে আর তখন যদি কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, এই আরকি। আমি অনেক বার বলেছি যে যাও, কোনও বড়ো জায়গায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে চিকিৎসা করাও। কিন্তু শুনলে তো! বলে টাকা নেই, তাই পারবে না।"

-"হুঁ বুঝলাম। ঠিক আছে আমি দেখছি যদি পরশু দিন যেতে পারি। ওদের নাম ঠিকানাটা দিন। পৌঁছে কোনও অসুবিধা হলে আপনাকে ফোন করব।"

ফোনটা ছেড়ে সায়ন উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল। তার ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি চলে যেতে। কিন্তু পরেরদিন কোলকাতায় একটা খুব দরকারি কাজ ছিল বলে তা সম্ভব ছিল না। সে লোকটার দেওয়া নাম্বারে চট্ করে ফোন করল।

-"হ্যালো দাদা, আমি সায়ন কর্মকার বলছি খবর বাংলা থেকে। আমি জানতে পারলাম যে আপনাদের বাড়িতে একটি ছেলে নাকি আগের জন্মের কথা বলে? মানে, সে নাকি জাতিস্মর।"

-"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমি ওর বাবা অনন্ত বাবু বলছি। আপনাকে কে বলল? আমি কিন্তু এটা নিয়ে কোনোরকম প্রচার চাই না। এমনিতেই পাড়া প্রতিবেশীদের ইয়ার্কি ঠাট্টায় আমাদের দুর্বিসহ অবস্থা।"

-"না না, আপনার কোনও চিন্তা নেই। বরং খবরটা যদি সত্যি হয়, তাহলে জানাজানি হলে আপনার টাকার সমস্যাটা হয়তো মিটে যেতে পারে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে যারা এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার ভার বহন করে। বুঝেছেন?"

-"আপনি সত্যি বলছেন? আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম জানেন। মুম্বইয়ের একটা বিশেষ হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়ার। কিন্তু ওখানে গিয়ে প্রায় একমাস থাকতে হবে। অতটাকা আমি পাবো কোথায়?"

-"আমিও তো তাই বলছি। আপনার কাছে আমি পরশুদিন যাবো। সব শুনবো। আর যদি সত্যি হয়, তাহলে এটা নিয়ে একটা বড়ো খবর করবো। তখন টিভি থেকেও লোক আসবে। তখন দেখবেন যে টাকার আর চিন্তা থাকবে না।"

-"তা বেশ তো, এ তো খুব ভালো কথা। আপনি আসুন তাহলে।"

যাওয়ার দিন সায়ন ভোরভোর বেরিয়ে পড়ল। ট্রেন থেকে নেমে অটোতে করে আধঘণ্টা যাওয়ার পর সায়ন যেখানে নামল, সেখানে সামনেই একটা চায়ের দোকান। নিজের পরিচয় দিয়ে সে ঠিকানাটা জানতে চাইল। প্রথম দুইয়ের মধ্যে না পড়লেও 'খবর বাংলা'-র কাটতি বেশ ভালই। সেই সুবাদে চাওয়ালার একগাল হাসি আর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সায়ন পেয়ে গেল। সেই মতো রিক্সা করে আরও মিনিট পনেরো যাওয়ার পর সে নিজের গন্তব্যে পৌঁছল। রিক্সা থেকে নেমে সায়ন অনন্তবাবুকে একটা ফোন করল।

-"আমি আপনার বাড়ির একদম কাছাকাছি চলে এসেছি।"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনার ডানদিকে তাকান।"

সায়নও ভদ্রলোককে দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে সে নিজের পরিচয় দিল।

-"আসুন আসুন, আমার নামই অনন্ত বাবু। রুপু আমারই ছেলে।"

অনন্ত বাবুর বাড়ি পৌঁছে সায়ন চমকে গেল। বাড়িটা যদিও লোকালয়ের শেষ প্রান্তে কিন্তু আয়তনে বেশ বড়ো। কমপক্ষে দশকাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে বিশাল ফলফুলের বাগান। কত রকম গাছ যে আছে তার লেখাজোখা নেই। আম, জাম, কলা, পেয়ারা, সবেদা ছাড়া বাকীগুলো সে চিনতেও পারল না। বাগানটা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানোও। বাড়ির মধ্যে বসার ঘরটাও বেশ সুন্দর রুচিপূর্ণ ঝকঝকে আসবাবে ভর্তি। ছিমছাম আভিজাত্যের ছাপ। সমস্ত রকম আধুনিক বিলাসিতায় পরিপূর্ণ।

-"আপনি বসুন, আমি রুপুকে ডেকে দিচ্ছি।"

-"আচ্ছা অনন্ত বাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না। বাড়ি দেখে তো আপনাদের বেশ অবস্থাপন্নই মনে হচ্ছে। তাহলে টাকার অভাবে যে চিকিৎসা করাতে পারছেন না বললেন?"

অনন্ত বাবু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন, "আপনি হাসালেন সায়নবাবু। এসব আমার হলে কি আর ছেলেটাকে বিনা চিকিৎসায় পাগল হতে দিতাম? বাড়িটা আমার খুড়তুতো দাদার। ওরা সব বিদেশে। তাই আমাকে চৌকিদার বানিয়ে রেখেছে। অবশ্য এই দায়িত্ব দিয়ে ওরা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নাহলে আমার কেরানীর মাইনেতে সংসার চালানোটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত। আমার সাধ্য কী এতো বিলাসিতায় থাকা! যাক্ ছাড়ুন, রুপুকে ডেকে আনি।"

রুপুকে দেখে সায়ন বেশ চমকে ওঠে। এই অল্পবয়সে এতো গম্ভীর ছেলে সায়ন আগে কখনও দেখেনি।

-"কী রুপু, কেমন আছো?", সায়ন জিজ্ঞেস করল।

রুপু কোনও উত্তর না দিয়ে সায়নের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে একটা সোফায় গিয়ে বসল। ভুরুজোড়া ঈষৎ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? আমি কেমন আছি তাতে তোমার কী?"

সায়নের ঘাবড়ে যাওয়া মুখটা দেখে অনন্ত বাবু অপ্রস্তুত হয়ে এগিয়ে এলেন, "রুপুবাবা, ওরকম বলে না। উনি আমাদের ভালোর জন্যই এসেছেন। উনি যা জানতে চান বলে দিলেই উনি চলে যাবেন।"

গম্ভীর ভাবে কথাগুলো শোনার পর রুপু একটু ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা, কী জানতে চান বলুন।"

সায়ন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তা রুপু, তোমার ভালো নাম কী?"

-"কোন ভালো নামটা জানতে চাইছেন?"

সায়ন ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, "তোমার ক'টা ভালো নাম আছে? একটাই তো হয়, তাই না?"

-"কে বলল তোমায়? আমার এখন স্কুলের ভালো নাম পরিতোষ আর আগের ভালো নাম জমিদার রায়বাহাদুর বীরেন্দ্রপ্রতাপ রায়।"

সায়ন সবে জলের গ্লাসটায় চুমুক দিতে যাচ্ছিল। আরেকটু হলেই একটা রাম বিষম খাচ্ছিল আর কি! বলে কি পুঁচকেটা!

-"ওরকম রামছাগলের মতো কী দেখছ? যা জানতে চাও বললাম তো। বলো আর কী জানতে চাও।"

সায়ন কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। পাঁচ বছরের বাচ্চা কে বলবে! যেমন গুরুগম্ভীর মেজাজ তেমন ডাঁটিয়াল হাবভাব। তার থেকে তিরিশ বছরের বড়ো হয়েও সায়নকে রীতিমতো সমীহ করে কথা বলতে হচ্ছে।

-"তাহলে তোমার দ্বিতীয় নামটা আগেকার নাম বললে। কিন্তু আগেকার মানে ঠিক বুঝলাম না।"

রুপু বিরক্তিতে নিজের পা চাপড়ে বলল, "উফ্ অসহ্য,

তোমার মতো আহাম্মকের সাথে কথা কইতে আমার বিষম বিরক্তি হচ্ছে। এই তো বললাম আগেকার নাম, তা না বোঝার কী হল? আমি আগের জন্মে এই নামেই সারা জগতে পরিচিত ছিলাম, বুঝলে।"

রুপুর আচরণের মধ্যে এমন একটা রাজকীয় কতৃর্ত্ব-সুলভ হাবভাব ছিল যে সায়নের মনে আপনা হতেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব জেগে উঠল।

-"আচ্ছা, বুঝেছি। আসলে রুপু, আমি তো তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। তাই তুমি যদি আমাকে একটু ভালো করে খুলে বল, তাহলে আমি তোমার আগেকার জন্মের সম্পর্কে বেশ গুছিয়ে লিখতে পারব। তাতে তোমার হারিয়ে যাওয়া অতীতের ব্যাপারে কতোলোকে জানতে পারবে বল তো।"

সায়ন ঝানু রিপোর্টার। তাই এই ক'মিনিটেই রুপুর এই বিচিত্র হাবভাব দেখে সে এই মোক্ষম চালটা চেলেছিল। সে বেশ বুঝেছিল যে রুপুকে যতই সাধাসাধি কর সে হয়তো কিছুই বলবে না। যতদূর সম্ভব, এর আগে তার বন্ধুবান্ধব আর পাড়ার লোকের কাছে তার এরকম কথাবার্তার জন্য যথেষ্ট বিড়ম্বনায় নিশ্চয়ই পড়তে হয়েছে। হয়তো তার এই জাতিস্মরের প্রলাপগুলো নিয়ে অনেক ব্যঙ্গতামাশাও হয়েছে। তাই রুপুকে যদি যথাসম্ভব আশ্বাস দেওয়া যায় যে তার কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হবে, তবেই হয়তো সে মুখ খুলবে।

-"দেখো রুপু, তোমার কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি সারা পৃথিবীতে আমি তোমার কথা জানাব। তুমি যে পাগল নও, প্রলাপ বকছো না, সেটা তোমার শুধু বন্ধুরা নয়, পাড়ার সব লোকেরাও জানবে। তখন দেখবে কেউ আর তোমাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা কিচ্ছু করতে পারবে না।"

সায়নের এই কথাগুলো শোনার পর রুপুর মুখে জমে থাকা সংশয়ের কালো ছায়াটা সরে গেল।

-"তাহলে ঠিক আছে। আমি তো শুধু এটাই চেয়েছি সবাই বুঝুক আমি মিথ্যা বলছি না। আমার যদি আগের জন্মের সব কথা মনে থাকে, তাতে আমি কী করতে পারি? আমার ভেতরে সারাক্ষণ মনে হতে থাকে যে আমি রাজা রায়বাহাদুর বীরেন্দ্রপ্রতাপ। আমার তখনকার বাড়ি, পোশাক, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি হঠাৎ হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর তখন আমার চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা সব কেমন যেন বদলে যায়।"

-"তুমি একদম ঠিক বলেছ রুপু। আসলে কি বলতো, এখনকার লোকেরা তো কখনও কেউ এরকম শোনেনি বা দেখেনি। তাই তোমার কথা বিশ্বাস করতে ওদের কষ্ট হচ্ছে। তবে তুমি দেখো, কাগজে বড়ো করে খবর বেরোলে তখন সবাই তোমাকে নিয়ে হইহই করবে। তখন তুমি এক বিশাল সেলেব্রিটি হয়ে যাবে। যাক্ ছাড়ো, তুমি আমাকে এবার সব গুছিয়ে বল দেখি।"

এরপরের তিনঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল, সায়ন বা রুপু কারোরই খেয়াল হল না। লিখতে লিখতে সায়নের হাত টাটিয়ে গেল। বীরেন্দ্রপ্রতাপের সম্বন্ধে বলা রুপুর যেন আর শেষ হয় না। যেন তার চোখের সামনে সিনেমা হচ্ছে আর সে তা দেখে আওড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তাদের বিশাল অট্টালিকার মতো জমিদার বাড়ির বর্ণনা, তাদের গোশালা আর ঘোড়াশালায় ক'টা গরু আর ঘোড়া থাকত, নাটমন্দির কেমন ছিল এইরকম বহু কথা গড়গড় করে বলে গেল। তার বাবার দরবারের কথা, তাদের সিন্দুকের রত্নভাণ্ডারের কথা, রাজপুরোহিতের পুজোর প্রক্রিয়ার কথা আরো কতো কী। বেলা দুটো পেরিয়ে যেতে সায়ন ভাবল আর দেরি করা ঠিক হবে না। অফিসেও তার অনেকগুলো দরকারি কাজ পড়ে আছে।

-"আচ্ছা রুপু, আজ তাহলে উঠি। খবরটা বেরোলে আমি আরও অনেককে নিয়ে আসব। তারপর দেখবে টিভিতেও তোমাকে দেখাবে। তখন দেখবে তোমাকে নিয়ে সবাই কেমন হইচই করে। অনন্ত বাবু একটু দোনামনা করে সায়নের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "সায়ন বাবু, বলি কি বেলা এতো হয়ে গেল, আপনি অন্তত দুমুঠো কিছু খেয়ে যান। এভাবে না খেয়ে বেরোলে আমাদের অমঙ্গল হবে।"

-"আরে দুর্ মশাই, ওসব আমি মানি না। তাছাড়া সত্যি বলছি আমার ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। চিন্তা করবেন না, খবরটা বেরোনোর পর যখন আসব পেটপুরে খেয়ে যাব। ও আচ্ছা ভালো কথা, রুপুর কি কোনও ভালো ছবি হবে?"

-"হ্যাঁ হবে তো। ওর একটা সুন্দর পোশাক পরা ছিমছাম ছবি আছে। গেলবার দাদারা যখন বিদেশ থেকে এসেছিল ওরা তুলেছিল। এক মিনিট, আনছি।"

সায়নের অফিসে ফিরতে সাড়ে চারটে পেরিয়ে গেল। জমে থাকা কাজগুলো হন্তদন্ত হয়ে শেষ করে সে রুপুর স্টোরিটা নিয়ে বসল। সম্পাদককে সে আগেই ম্যানেজ করে রেখেছিল যাতে খবরটা সে'রাতেই প্রেসে যায়। তাই খসড়াটা সে ঝটপট করে এডিটিং ডেস্কে মেল করে দিল। কিছুক্ষণ পর নিজে গিয়েও একবার তাড়া দিয়ে এল। তবুও ফাইনাল স্টোরিটা হতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেল। সায়ন ব্যাচেলর তাই ফেরার কোনও তাড়া নেই। তাই সে ঠিক করল রাতটা অফিসের গেস্টরুমেই কাটিয়ে দেবে। খুচখাচ কিছু কাজ সেরে সায়ন যখন শুতে গেল তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁইছুঁই। সারা-দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটনির জন্যই হোক বা খবরটার তৃপ্তিতে, অফিসের চিলড্ এসিতে সায়নের ঘুমটা তোফা হল। ঘুম ভাঙতে ন'টা পেরিয়ে গেল। উঠে চোখমুখ ধুয়ে মেশিন থেকে কফি নিয়ে সে আয়েস করে বসল। যত এক এক করে তার সহকর্মীরা ঢুকতে থাকল ততই অভিনন্দনের বন্যা বইতে লাগল।

-"কি দিলে বস্, কাঁপিয়ে দিয়েছ।"

-"হ্যাঁ রে সায়ন, টিপসটা কে দিয়েছিল রে? আমাকেও

একটু দু-একটা দাও গুরু।"

-"সায়নদা, এক খবরেই তো আমাদেরকে নাম্বার ওয়ান বানিয়ে দিলে।"

ইতিমধ্যে সম্পাদক সাহেবও চলে এলেন। সায়নকে দেখে তিনি সোজা তার দিকে এগিয়ে এলেন।

-"খবরটা সত্যি দারুণ হয়েছে, ব্রাভো।"

আরো প্রায় ঘন্টাখানেক পরে অভিনন্দনের পালা শেষ হতে সায়ন রওনা দিল। খুশিতে তার দু'পা মাটিতে পড়ছিল না। এবার হয়তো তার সমস্ত অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূর্ণ হবে।

পরদিন সকালে অফিসে এসে আরেকপ্রস্থ প্রশংসার ঢেউ পেরিয়ে সে নিজের চেম্বারে ঢুকল। আর তখনই তার চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা একটা মোটা পুরু খামের ওপর। তুলে দেখে সেটা শহরের একটা নামকরা ল ফার্ম থেকে এসেছে। ব্যাপারটা কিছু ঠাউর করতে না পেরে সায়ন খামটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল। ভাঁজ করা দামি লেটারহেডটা খুলতেই তার কপালে গভীর ভাঁজ পড়ল। চিঠিটা আসলে ডাক্তার সুবিমল সেনের তরফ থেকে একটা মানহানির মামলার চিঠি। নামটা পড়েই সায়ন চমকে উঠল। চিঠিটা যত সে পড়তে থাকল ততই কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যেতে লাগল। ডাক্তার সেন অভিযোগ করেছেন যে সায়ন নাকি সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাবে ওনার একমাত্র ছেলেকে জাতিস্মর সাজানোর চেষ্টা করেছে। এর ফলে উনি এবং ওনার ছেলেকে বহু আপত্তিকর ও বেদনাদায়ক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি এক কোটি টাকা

দাবি করেছেন।

-"এই সায়ন, বস্ তোকে ডাকছে। এবার বোধহয় তোকে মাথায় তুলে নাচবে।"

মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে সায়ন সম্পাদকের ঘরে ঢুকল।

-"সায়ন, এসবের মানেটা কী? তোমাকে পাঠানো লিগ্যাল নোটিসের একটা কপি আমার কাছেও এসেছে। যাঁর ছেলে তিনি তো বলছেন পুরো ব্যাপারটাই তোমার বানানো! এটা কি সত্যি? আমরা তো কাউকে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

-"স্যার, বিশ্বাস করুন, ছেলেটা নিজের মুখে আমাকে সব বলেছে। আমিও তো এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।"

-"আমি ওসব জানিনা। তুমি যদি নিজেকে ঠিক প্রমাণ না করতে পারো, সে দায় তোমার। খবরটা তুমি করেছ ক্ষতিপূরণও তুমিই দেবে।"

সায়নের সব কিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কালবৈশাখীর এক দমকা হাওয়ায় তার সমস্ত রঙিন স্বপ্নগুলো যেন খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। ক্লান্ত পায়ে নিজের চেম্বারে ঢুকতেই ইন্টারকমটা বেজে উঠল।

-"সায়ন বাবু তো?", একটা ভারী গলার আওয়াজ জিজ্ঞেস করল।

-"কে বলছেন?"
-"আমি ডাক্তার সুবিমল সেন বলছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমায় মনে পড়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে বছর তিনেক আগেকার ঘটনাটা। মনে পড়ে, আপনার মাসতুতো বোন সিজার করার সময় মারা যেতে আপনি কী করেছিলেন? কোনও কিছু না বুঝে, আমার কোনো বক্তব্য না শুনে প্রথম পাতায় কী না লিখলেন! শুধু একটা রগরগে খবর করবেন বলে আমার কী সর্বনাশ করেছিলেন! একবছর পর আদালত যখন আমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ আখ্যা দিল, তখনও আপনাকে কত অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আমার নির্দোষ প্রমাণিত হওয়াটা আপনার কাছে যোগ্য খবর মনে হল না।"

-"না না, আমি তো ছেপে ছিলাম। ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনার নির্দোষ হওয়ার খবরটা ছেপেছিলাম আমি", মরিয়া হয়ে সায়ন বলল।

-"বেশ বললেন তো! প্রথম পাতাজুড়ে কুৎসার মহাভারত আর পাঁচ নম্বর পাতায় দুছত্র লেখাটা এক হয়ে গেল? আপনার নোংরামিতে আমার এতবছরের কষ্ট করে অর্জন করা নামসম্মান সব ধুলোয় মিশে গেল। লজ্জায় ছ'মাস পাড়ায় বেরোতে পারিনি। রাতের পর রাত ঘুমোতে পারিনি। দু'বছর ধরে ডিপ্রেশনের ওষুধ খেতে হয়েছে। সবকিছু শুধু আপনার জন্য। নেহাত আমাদের প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি, তাই টাকার অভাব হয়নি। তখন মানহানির মামলা কেন করিনি জানেন? কারণে ওসব ক্ষেত্রে আইনের ফাঁকফোকর গলে আপনি ঠিক পার পেয়ে যেতেন।"

-"কিন্তু আমি তো এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলেটা কে? অনন্ত বাবু কি ওর বাবা নয়?"

-"ও আমারই ছেলে। এখন ছ'বছর। অনন্ত মানে আমার ছোটভাইয়ের গুণে এইবয়সেই ও নাটকে তুখোড়। ওর কাকার সঙ্গে নিয়মিত নাটকও করে। ঝরঝর করে পার্ট মুখস্থ বলে। বাড়িটা আমাদেরই।"

-"তাহলে ও আদৌ জাতিস্মর নয়? পুরোটাই সাজানো?"

-"সেটা এখনও বলে দিতে হবে সায়ন বাবু? পাড়ার লোক সেজে ফোনটা আমিই করেছিলাম। ফোনটাও আমি ল্যান্ডলাইনে করলাম যাতে কোনও রেকর্ডিং না থাকে। নোটিসটা তৈরিই ছিল, শুধু কালকের ডেটটা বসিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্ত কাগজের অফিস আর টিভি চ্যানেলেও একটা করে কপি গেছে। আগের জন্মে জেল খেটেছেন কিনা জানি না। তবে এজন্মে খাটতে না চাইলে টাকাটা রেডি রাখবেন।"

চেয়ারে ধপ্ করে বসার ঠিক মুহূর্তে একঝলকে সায়নের কথাটা মনে পড়ে গেল। তিন বছর আগে ঠিক এই দিনেই ওর মাসতুতো বোন রিমা মারা গিয়েছিল!

কাপল শো

অনামিকা তেওয়ারী

— আজ বিকেলটা ফাঁকা রেখেছো তো?

সুমন কম্পিউটার স্ক্রিনের ওপর থেকে মুখ তুলে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। ভাবখানা এমন, যেন বুঝতেই পারছে না, কেন জিজ্ঞেস করছি। ফিরতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জানতে চাইলো,
— আজ বিকেলে কোথাও যাচ্ছি নাকি আমরা?

বুঝলাম, ভাব টাব নয়, ও সত্যিই বুঝতে পারেনি। আর কত ঝগড়া, অভিমান করবো! এখন মনে হয় ওসব করা মানে নিজের সময় আর মন নষ্ট করা। তারচেয়ে বলেই দিলাম,

— সিটি মল, ভুলে গেলে? কেকা, রীতা ওরাও তো আসছে।

— ও হ্যাঁ, ফাঁকা আছে তো। সেদিন বলেছিলে না আজ যাবে, তাই আজ ফাঁকা রেখেছি বিকেলটা। দেখছো, নিজেই ভুলে গেছি কেমন!

এইরকম সময়ে জোড়া, তাপ্পি মেরে কথা বলাটা সুমনের নেচার। আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।

নিজের জন্য একটা গোলাপি শাড়ি বেছে রেখেছি, আজ

পরবো বলে। সুমন আবার ম্যাচিং করে পরা পছন্দ করে না। কেকা খুব করে বলেছে, 'আজ অন্তত ম্যাচ করে পরে আয়'...। আমি বললে সুমন কখনই পরবে না। তাই বুদ্ধি করে ছেলেকে বললাম, যা না পাপাইকে বল পিংক আর হোয়াইট চেক শার্ট'টা পরতে। বলবি, এটা পরলে তোমাকে খুব কুল লাগে পাপাই।
আমার ছয় বছরের ছেলে এত কিছু বোঝেনা, নাচতে নাচতে ওর পাপাই এর কাছে গিয়ে আমার শেখানো কথাগুলো তোতাপাখির মতো আউড়ে এল। মনে মনে চাইলাম, আজ অন্তত ওই শার্ট'টা তুমি পরো সুমন।

পড়ন্ত বিকেলে রোদের তাপ অনেকটাই কম, দুপুরের গরম বাতাস এখন একটু একটু করে ঠান্ডা হচ্ছে। দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিলাম। ফুরফুরে বাতাস এসে তাজা করে দিল কিছু পুরোনো স্মৃতি। সুমনের প্রিয় জায়গা ছিল এটা, এখানে বসেই ও আর.ডি. বর্মনের গান শুনতো। আমি শুয়ে থাকলে, জোর করে টেনে তুলে বলতো, 'আরে কি শুয়ে আছো এখনও! এই বাতাসটা এখনও ফ্রেশ, একটু পরেই বল্টুদের গ্যারেজ থেকে গাড়ির ধোঁয়া এসে মিশবে। ওঠো ওঠো।' বল্টুদের গ্যারে-জটা এখন আর নেই, বড় দোকান হয়ে উঠে গেছে মার্কেটের দিকে। তাই শুদ্ধ বাতাসই আসে এখন। তবে সুমনের সেই শখটা এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। সময়ের সাথে বয়স, বয়সের সাথে কাজের চাপ আর কাজের চাপের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষটাও কেমন যেন বদলে যাচ্ছে!

— কি হল জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছো যে, এখনও রেডি হওনি?

সুমনের গলা পেয়ে চমকে উঠি। যাক ওই শার্ট'টাই পরেছে ও। আমি চুল বেঁধে, মেক আপ করে হাফ রেডি হয়েই ছিলাম। শাড়িটা পরিনি, ভেবেছিলাম যদি সুমন অন্য শার্ট পরে তাহলে তার সাথে ম্যাচিং করে অন্য শাড়ি পড়বো। খুব আনন্দ পেলাম মনে মনে। ওকে কথায় ব্যস্ত রেখে আলমারি থেকে পিংক শাড়িটা বার করে পরে নিলাম। এখন আর ততটা খেয়াল রাখে না সুমন, আমার শাড়ির রঙ দেখতে ওর বয়েই গেছে!

সময়মতো সিটি মলের কাছে পৌঁছেছি আমরা। রীতা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লো। একটা নীল রঙের ড্রেস পরে এসেছে রীতা, ওর হাজব্যান্ড অমিতদাও নীল পোশাকে। সুমন হেসে বলে,

— কেমন ম্যাচিং করে পরেছে দ্যাখো দুজনে!

আমি ঠোঁট চেপে হাসি। দুটো রঙের চেক শার্ট'টা বলে সুমন এখনও ধরতে পারেনি যে

আমিও ওর সাথে ম্যাচিং করেই পরে এসেছি। কেকাও এসে পড়ল খানিক বাদেই। আমার দুই বান্ধবী খুব সমঝদার। ভুলেও সুমনকে টের পেতে দেয় না এই ম্যাচিং এর ব্যাপারটা। বর গুলোকেও মনে হয় শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছে। লজ্জাও লাগছে আমার, না জানি কি ভাবছে এখন ওরা! আমাকে দেখে ওদের করুণা হচ্ছে না তো! হলেই বা কি করবো। আমার অবস্থা এখন অনেকটা, কে কী ভাবলো তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, কাজটা হলেই হল টাইপের। বাচ্চাদের ফান গেমসে ব্যস্ত করে আমরা নিজেদের মতো করে ঘোরাঘুরি কর-ছিলাম। বারবার ঘড়ি দেখছি, শো টা এখনও শুরু হয় না কেন!

হঠাৎ জোরে জোরে অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এই 'ম্যাড ফর ইচ আদার' কাপল শো'টি শুরু করতে চলেছি। আগ্রহীরা চটপট আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসুন।

রীতা এইসব খবরগুলো বেশ জোগাড় করে নেয়। ও-ই তো আমাদের জানিয়েছিল টিভি টেন চ্যানেল আজ এই মলে একটা কাপল শো অরগানাইজ করছে। সুমন জানতে পারলে আগেই 'না' বলে দিত। তাই আমিও প্রথমে না-ই বলেছিলাম। কিন্তু রীতা ছাড়বার পাত্রী নয়, বলেছিল 'একবার ট্রাই করে দ্যাখ্ না। শুনেছি এই শো গুলোতে খুব মজার মজার রাউন্ড থাকে। তোর বরটা একটু যদি খুঁজে পায় নিজেকে।'
লোভে পড়ে হ্যাঁ করে দিলাম। সুমনকে আবার একবার নতুন করে পেতে ইচ্ছে করে খুব, তাই ভাবলাম দেখাই যাক চেষ্টা করে।

সুমন যখন জানতে পারলো এই শো'য়ে আমরা অংশগ্রহণ করছি, ও একটু বিরক্ত হল। আমাকে আড়ালে ডেকে বলল,

— কিসব বাচ্চাদের মতো বায়না করো তুমি! এসব করার সময় আছে আর, এগুলো ওই উঠতি বয়সের কাপলরা করে।

আমি কিছু বলার আগেই কেকা দৌড়ে এসে সুমনকে বললো,
— আড়ালে, আবডালে আজ কোনও কথা হবেনা সুমন। যা বলার চলো ওই স্টেজে গিয়ে বলি। কাম অন, আমার হাজব্যান্ড তোমার থেকে দু-তিন বছরের বড়ো। ও যখন যাচ্ছে, তুমি কেন নয়!

সুমন আর জেদ দেখাতে পারল না। এমনিতে বাইরের লোকজনের কাছে ও খুব পোলাইট। যত জেদ আমাকেই দেখাতে হয় ওকে!

আমাদের বাচ্চাদের সে কি উৎসাহ। বিশেষ করে আমারটি তো আনন্দে লাফিয়েই চলেছে, বাবা মা'কে এই প্রথম একসঙ্গে স্টেজে দেখছে ও। প্রথম কয়েকটি রাউন্ডে ভালই ফল করলাম আমরা। একটা রাউন্ডে তো আমার পিঠে ঝুড়ি বেঁধে দিয়ে সুমনকে বল থ্রো করতে বলা হল। যে যার বউয়ের পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে যত বেশি বল ঢোকাবে সেই জিতবে। সুমন খুব ভালো ফিল্ডিং করতো একসময়। কেকা সেটা জানতো বলেই বলে উঠল, 'হয়ে গেল, এখানে তো সুমনই জিতবে।' কেকার ভবিষদ্বাণীই সত্যি হল। ওই রাউন্ডে আমি আর সুমন সবচেয়ে বেশি স্কোর করে ফাইনালে উঠলাম। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে আমি সুমনকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে ফেললাম। ওর জন্যই তো এই রাউন্ডে আমরা জিতলাম। আশ্চর্যের বিষয় হল, সুমন একটুও আপত্তি করলো না! উল্টে দুই হাতে চেপে ধরল আমার পিঠ। প্রাণ ভরে অনুভব করলাম, ওর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। শেষ কবে পেয়েছি, মনে নেই!

কেকারা ছিটকে গেল প্রতিযোগিতা থেকে। অথচ ওর উৎসাহটাই বেশি ছিল, খারাপ লাগল ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আজ হয়তো শেষ হাসি আমরাই হাসব। সবকটা বল ঝুড়িতে ঢুকেছে, আমাদের স্কোর অনেকটাই বেশি। রীতা আর ওর হাজব্যান্ড, সেইসাথে আর একজোড়া দম্পতির সাথে শুরু হল আমাদের ফাইনাল রাউন্ড। সুমন আমার হাতটা হঠাৎ করে চেপে ধরেছে। টের পেলাম ওর হাতের তালুতে ঘাম জমছে। ওর মুখের দিকে তাকালাম, খুব মন দিয়ে সঞ্চালকের ঘোষণা শুনছে। যেন এক ঝলক দখিনা বাতাস বল্টুদের পুরোনো গ্যারেজের পাশ দিয়ে, আমাদের ঘরের ওই জানলা হয়ে এসে ছুঁয়ে গ্যালো আমাকে! আমি কেকার দিকে তাকালাম, ও চেঁচিয়ে বলল, 'অল দ্যা বেস্ট '...

সঞ্চালক আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—এই যেমন আজ আপনারা ম্যাচিং করে পোশাক পরে এসেছেন, ঠিক তেমন কতোটা মিল আপনাদের মনেও আছে সেটাই এই

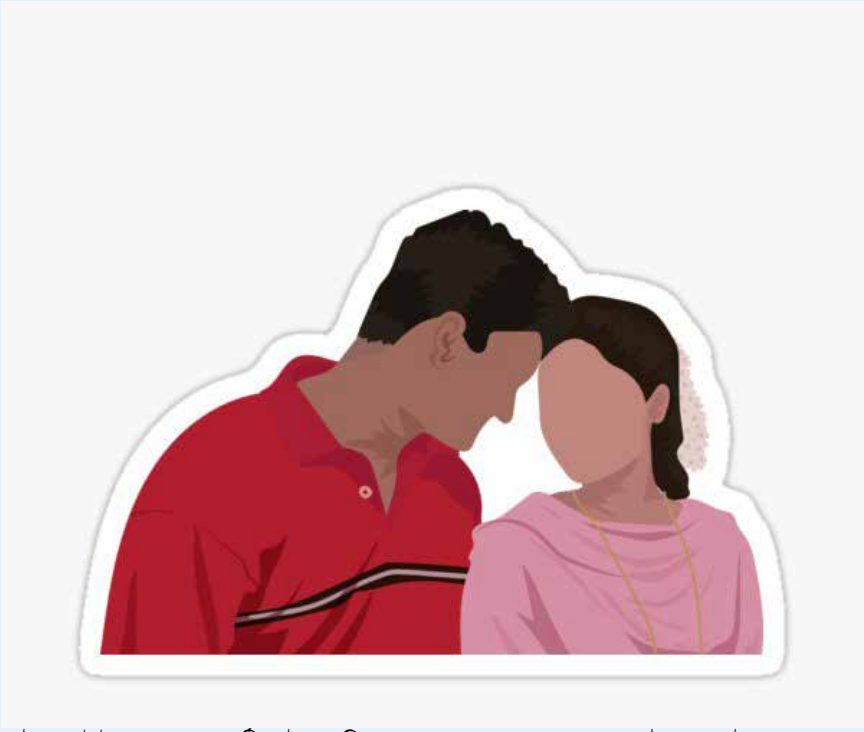

রাউন্ডে টেস্ট করা হবে। সঠিক উত্তর দিলে পাঁচ নম্বর, আর ভুল হলে মাইনাস তিন। কি বলছেন সবাই, শুরু করা যাক তাহলে?

আশেপাশে একটা ছোট্ট ভিড় জমেছিল। তাদের সমোচ্চারিত ধ্বনির মাঝেই খুব কষ্ট করে শুনলাম, সুমন আমাকে জিজ্ঞেস করছে,

— তুমি আজ ইচ্ছে করে ম্যাচিং করেছো না কি?

না শোনার ভান করে আমি বললাম,

— পরে শুনবো। এখন খেলায় মন দিই।

শুরু হল আমাদের ফাইনাল রাউন্ডের খেলা। প্রত্যেক কাপলকে একটা কাগজ আর পেন দিয়ে দুই প্রান্তে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতে বলা হল। তারপর সঞ্চালকের এক একটি প্রশ্নের উত্তর, দুজনের দিকে না তাকিয়ে লিখতে হবে ওই কাগজে। বেশ মজার খেলা, আগেও দেখেছি টিভিতে। তবে নিজেদের মধ্যে এই খেলা হবে ভেবে খুব ভাল লাগছিল। আমার ছেলে বলে উঠলো, ‘মা, পাপাই মন দিয়ে আঙ্কেলের প্রশ্ন গুলো শুনবে।’ ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। সঞ্চালক মজা করে বললেন,

— ঠিক বলেছিস, আজ মা বাবাদের পরীক্ষা

নেওয়া হবে। কে কত মনোযোগী সেটাই দেখার।

প্রথম প্রশ্ন এলো, আমাদের প্রিয় রঙ কী? সুমনের প্রিয় রঙ সবুজ, তাই আমাদের ঘরের সব দেওয়ালে ও সবুজের নানা রকম শেড দেওয়া রঙ করিয়েছিল। আমার পছন্দ গোলাপি। পরের প্রশ্ন, প্রিয় পোশাক, সুমন ফরমাল ড্রেস পছন্দ করে। ওর জন্য জামাই-ষষ্ঠীর কেনাকাটা আমাকেই তো করতে হয়। কিন্তু আমি লং স্কার্ট পরতে খুব ভালোবাসি। তার পরের প্রশ্ন, প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। আমাদের দুজনের পাহাড় পছন্দ বলেই আমরা হানিমুনে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। এরপর একটু অন্য রকম প্রশ্ন পেলাম, আমাদের রাগ হলে কীভাবে তা ভাঙাতে হয়। সুমনের রাগ খুব একটা নেই, মাঝে মধ্যে মুড অফ থাকলে ওকে ভাল কিছু রেঁধে খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যায়। তবে ইদানীং আমার রাগ হলে সুমন আর ভাঙানোর চেষ্টাও করে না। নিজে থেকেই ঠিক হতে হয় আমাকে। তার পরের প্রশ্ন, শেষ কবে দুজনে বলেছি, আই লাভ ইউ... ঠিক মনে নেই, ছেলে হবার আগে ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে বলেছিলাম বোধহয়। ওটাই লিখলাম। সুমন মনে হয় হানিমুনে গিয়ে বলেছিল। প্রিয় খাবার, সুমনের পছন্দ ডাব চিংড়ি। আর আমার ভীষণ পছন্দের মায়ের হাতের তৈরি ছানার পায়েস। ‘ছয়ে ছক্কা’র এই রাউন্ড ছয় মিনিটের মধ্যে শেষ হল। এবার ফলাফল ঘোষণার সময়। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,

— কি গো সব ঠিক করে লিখেছো তো?

একটু হোঁচট খেল সুমন। বললো,

— মনে তো হয়! তুমি ?

— আমি সব পেরেছি। মনে হচ্ছে আমরাই জিতবো। তাহলে কিন্তু আজ রীতা আর কেকা ট্রিট না নিয়ে ছাড়বে না।

ফলাফল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সঞ্চালক। আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন,

— কতো বছর সংসার করছেন?

সুমন বলার আগেই আমি বললাম,

— আট বছর।

সঞ্চালক প্রথমেই আমাদের লেখা কাগজ-টাই পড়ে শোনাতে শুরু করলেন। দুজনের নিজের পছন্দ আর পার্টনারের পছন্দ পাশাপাশি লেখা। বেড়ানোর জায়গা আর প্রিয় রঙ ছাড়া আর কোনও উত্তরই ঠিকঠাক

লিখতে পারেনি সুমন! কিন্তু আমি সবকটা ঠিক ঠাক লিখেছি। একটা বিষণ্ণতা বোধ চেপে বসল মনের মধ্যে। সুমনের দোষ নেই, ও কখনো জানার চেষ্টাই করেনি আমাকে। আমি ছেলের পেছনে যত ব্যস্ত হয়েছি, ও ততই বেশি করে মনোযোগী হয়েছে ওর কেরিয়ার নিয়ে। আমার ছোটখাটো অসুখের দিনগুলোও অভিমান করে সুমনের কাছে লুকিয়েছি, মনে হত ও নিজে কেন অনুভব করে না! আবার ওর কাজের উন্নতিতে, এক্স-ট্রা পারফরম্যান্স পয়েন্ট পাওয়াতে আত্মীয় স্ব-জনদের কাছে বড়াই করে গল্প করেছি। কবে থেকে যে নিজেকে ওর পছন্দ, অপছন্দের ছাঁচেই গড়ে ফেলেছি মনে নেই। আমিই ওকে একটা কমফোর্ট জোনে থাকতে অভ্যস্থ করে দিয়েছি, হয়তো বুঝতেই পারেনি আমারও কিছু দাবি, দাওয়া থাকতে পারে। আমারই উচিত হয়নি ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে এই শো'তে অংশ নেওয়া! লোকহাসি হল শুধু শুধু।

আমরা তৃতীয় স্থানে শেষ করলাম। অন্যদিকে পাঁচটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে রীতা আর ওর হাজব্যান্ড 'ম্যাড ফর ইচ আদার' খেতাব জিতে নিল। আমি দৌড়ে গিয়ে রীতাকে জড়িয়ে ধরেছি, ও বোধহয় পড়তে পারল আমার মনের কথা। বলল,

— সুমনের কাছে তুই এতটাই অচেনা! এগুলো তো খুব সাধারণ প্রশ্ন। এই খেতাবটা তোরা জিতলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম পায়েল। আমার চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠল। পাহাড়ে হানিমুন যাবার পরিকল্পনা আমার ছিল সেটা মনে আছে সুমনের, তবে রঙের ব্যাপারটা আজ আমাকে গোলাপি শাড়ি পরতে দেখেই আন্দাজে ঢিল মেরেছে ও। ছেলের মন খারাপ হয়ে গেছে খুব। কাঁদো কাঁদো গলায় আমার কাছে এসে বলল,

— পাপাইয়ের জন্য তুমি হেরে গেলে মা।

—কথাটা তীরের মতো এসে বিঁধলো আমার বুকে।

অভিনন্দন জানাতে সুমন কাছে আসে, রীতা বলে ওঠে,

— থ্যাঙ্ক ইউ। আসল কাপল শো তো আমরা আগেই জিতে গেছি সুমন। একে অপরকে জানা, জানতে চাওয়া, বুঝতে চেষ্টা করা, রাগ, অভিমানের খেয়াল রাখা, আর একসাথে একটুখানি কোয়ালিটি টাইম কাটানো এসবের মধ্যেই তো আসল রং মিলান্তি।

একটা গ্রুপ ছবি নেওয়ার জন্য আবার পাশাপাশি দাঁড়ালাম আমি আর সুমন। আমার চোখে চোখ রাখতে পারল না। ওর মুখটা দেখে মায়া হচ্ছে আমার। আরও একবার ওর হৃৎস্পন্দনটা অনুভব করতে পারছিলাম, আগের থেকে আরও বেশি জোরে। এটাই বা কম কী!

গল্প

ঘুম নেই

পৃথা কুণ্ডু

রাত একটা। ঘুম আসছে না। ডায়রি লিখছিল আল্পনা।

'বড় দুঃসময় চলছে আমাদের। অতিমারি এসে ওলট পালট করে দিল সব, কেউ বিশ মন চাল আর ছাব্বিশ মন আটা কিনে ঘরে দোর দিয়ে বসে রইলাম, কেউ করোনা নিয়ে কবিতা, প্যারোডি লিখে ভারচুয়াল লাইক পেল বিস্তর, কেউ বা সত্যি সত্যি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন বিপদের দিনে আর পাঁচজনের পাশে একটু দাঁড়াবার। হারালাম অনেক ডাক্তার-সেবাকর্মীকে, কাজ হারালেন অনেকে, আর আমরা বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ- আমরা দূরত্ব বাড়াতে বাড়াতে কখন যে চেনা মানুষকে অচেনা হয়ে যেতে দেখলাম আর নিজেকে চিনতেও ভুলে গেলাম, তার হিসেব রাখা হয়নি।'

ঘরে বসেই অনলাইন ক্লাস নেওয়া, স্কুলের অন্যান্য কাজকর্ম করতে হচ্ছে যতটা সম্ভব। সেদিন হেডমিস্ট্রেস ফোন করে আর একটা রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব দিলেন। প্রচুর ডেটা চাই, সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে আপলোড করতে হবে। হেডমিস্ট্রেস বলেছেন, 'অন্য কোন কলিগের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারো, সে তোমাদের ব্যাপার- কিন্তু আমার দুই সপ্তাহের মধ্যে কাজটা চাই।' আল্পনা একা তো পারবেই না, কম্পিউটারে খুব একটা সড়গড়ও নয় সে। তার নিজের ল্যাপটপ নেই, ভাইয়েরটা চেয়ে নেওয়াই যায়, কিন্তু ভাইকে কাজটা করে দিতে বলবে সে কোন মুখে? নিজের জ্বালায় নিজেই পাগল হয়ে আছে ছেলেটা। এদিকে বাড়িতে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। মা, বাবা, জেঠিমা সবাই বয়স্ক, নানা রকম শারীরিক সমস্যা তাঁদের এমনিতেই। ওঁদের নিয়েই বেশি চিন্তা। বাজার-ব্যাঙ্ক সবকিছুই দুই ভাইবোনকে ভাগাভাগি করে করতে হচ্ছে। ছোটন দায়ে পড়ে এসব করছে ঠিকই, কিন্তু বাকি সময়টা কেমন গুম হয়ে থাকছে, আর কিছু বলতে গেলে, বোঝাতে গেলে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। খুব স্বাভাবিক, চাকরিটা দুম করে চলে গেল বেচারার...

কাল সকালে দীপ্তিদিকে ফোন করতে হবে অগত্যা। ও যদি একটু হেল্প করে দেয়, ভাল হয়। দীপ্তিদি অনেক সিনিয়র, একটু মেজাজি, খিটখিটে স্বভাবের। তাকে ঝাড় দেয় প্রায়ই, টেরাব্যাঁকা কথাও শোনায়, তবে তাতে সে কিছু মনে করে না। দীপ্তিদি তার চাইতে পড়াশোনায় অনেক ভাল, কলেজে সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল ওর। বিয়ে করেনি, মা মারা যাবার পর অসুস্থ বাবার দেখাশোনা করতে গিয়ে আর পিএইচডিটাও কমপ্লিট করতে পারেনি। এই ছোট স্কুলে সত্যি ওকে মানায় না, সেই ক্ষোভ আর জ্বালা থেকেই

ওর মেজাজটা ওরকম হয়ে গেছে। স্কুলের অন্যরা ওকে বলে 'আঁতেল'। আল্পনার সঙ্গে অবশ্য ওর যুদ্ধ নেই কোন, পিঁপড়ের সঙ্গে কি আর লড়াই করা যায়! এমনিতে ওকে বরং একটু করুণার চোখেই দেখে দীপ্তিদি।

সকালে উঠে ফোনটা করে আল্পনা। বেজে যায় তিন-চারবার। দীপ্তিদি অবশ্য সবসময় ফোন ধরে না। থাক, সন্ধ্যায় আবার করবে। আর দু-একজন যাদের সঙ্গে একটু ভাল সম্পর্ক, তাদের ফোন করে দেখা গেল, কেউই ভাল নেই। হাজারটা অসুবিধে সবার ঘরেই। শুভেন্দুদার কোভিড পজিটিভ হয়েছে, মালাদির অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়ি আর দুটো বাচ্চার পরীক্ষা নিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে। তাঁর আবার বাড়িতে কম্পিউটার নেই, তাও বললেন- হাতে লেখার কিছু থাকলে বল, একটু ফাঁকতালে করে রাখতে পারি। আল্পনা আর কি বলে! 'ঠিক আছে গো, আমি দেখছি। দরকার হলে বলব।'

সন্ধ্যায় মেসেজটা এল। 'অনেকবার ফোন করেছিলি। কেন ধরতে পারিনি সেটা জানিয়ে দেওয়া উচিত। বাপি আজ ভোরে চলে গেছে।... ডোন্ট ট্রাই টু কল মি। স্কুলে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি ন্যাকা ন্যাকা সিম্প্যাথি সহ্য করতে পারি না। তোকে বাপি পছন্দ করত, তাই জানালাম। ক্লাসগুলো দু তিনটে দিন পারলে ম্যানেজ করিস।'

আল্পনার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। মেসো-মশাই নেই? দীপ্তিদির বাড়ি আগে দু-তিনবার গিয়েছিল সে, স্কুলের কাজেই- ওইটুকু আলাপেই মেসোমশাই কেন কে জানে, ভালবেসে ফেলেছিলেন তাকে। প্রথমে 'কাকু' বলে ডেকেছিল আল্পনা, আজকাল সবাই তাই বলে। উনি হেসে বলেছিলেন, 'তোমার বাবার চেয়ে আমি বোধহয় বড়ই হব মা! আমাদের সময় আমরা বন্ধুবান্ধবের মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশাই বলতাম।' সেই থেকে ওঁকে মেসোমশাই বলত আল্পনা। ফোনেও কথা হয়েছে বেশ কয়েকবার।

দীপ্তিদি নিজেই যখন কথা বলতে চাইছে না, ওকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। ভেবেচিন্তে একটা মেসেজই করে আল্পনা, 'কী বলব সত্যি জানিনা। মেসোমশাই যেখানেই থাকুন, শান্তিতে

থাকুন... তুমি সাবধানে থেকো। তুমি যদি না চাও, আমি কাউকে জানাব না। ক্লাস নিয়ে তুমি চিন্তা কোর না।'

কোন উত্তর আসে না। পরের দিন আবার লেখে আল্পনা, 'আত্মীয়রা কেউ এসেছেন? চিন্তায় আছি... তোমায় বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু কোন দরকার হলে প্লিজ জানিও।'

সেদিনই ওদের ছাত্রী পায়েল ফোন করে, 'দিদিমণি, আমার এবার বোধহয় পরীক্ষাটা দেওয়া হবে না।'

—'কেন? ও হ্যাঁ, তুমি বেশ কয়েকদিন ক্লাসে আসছ না, কী হয়েছে বল তো?'

—'বাবার চাকরি চলে গেছে দিদি', প্রায় কেঁদে ফেলে মেয়েটা, 'ফি দেব কি করে?'
মেয়েটা পড়াশোনায় ভাল। তার এরকম অবস্থা... না না, কিছু একটা করতে হবে।

আল্পনা বলে, 'তুমি অ্যাপ্লাই কর, আমিও বড়দির সঙ্গে কথা বলছি। নিশ্চয় কন্সিডার করবেন। পরীক্ষার তো এখনও দেরি আছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক না হলে...'

—'কিন্তু আমি তো ক্লাস করতেও পারছি না দিদিমণি। ফোনে ডেটা ভরতে অনেক খরচ হয়, বাড়ির এই অবস্থা...'

আল্পনা একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'শোন, তোমার ফোনে আমি ডেটা ভরে দেব, আপত্তি নেই তো?'
—'না না দিদি, বাবা শুনলে রাগ করবেন!'
—'রাগ করার কী আছে, আমরাও তো তোমাদের গার্জেনের মত। বাবাকে বুঝিয়ে বোলো, অসুবিধে হবে না।'

ফোনটা রেখে একটা শ্বাস ফেলে আল্পনা। পায়েল তার প্রিয় ছাত্রী, ওর বাড়ির অবস্থা সে জানে, তাই সহজে কথাটা বলে দিতে পারল। কিন্তু এমন আরও কতজন তো আছে, সবার কথা সে জানেও না, আর জানলেও... কতজনের পাশে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে তার? নিজের ভাইটার অবস্থা দেখে তার বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্যই সে কিছু করতে পারছে কি? 'এত ভাবছিস কেন, আমার তো চাকরি আছে, বাবার পেনশন আছে, তুই নতুন করে চাকরির পরীক্ষাগুলোর জন্য পড়াশোনা শুরু কর না, একটা না একটা হয়ে যাবে'– এরকম কটা ফাঁকা সান্ত্বনার কথা বলার বেশি আর কী বা করতে পারে সে! ছোটন রেগে যায় এসব শুনলে, 'আমাদের লাইনের কিছু জানিস না বুঝিস না, বকতে আসিস না! কত টাফ এখন নতুন কিছু পাওয়া, জানিস? নিজে জেনারেল লাইনে একটা চাকরি পেয়েছিস বলে ভাবিস দুনিয়াটা এমনি এমনি চলছে! তোদের ওইসব পাতি ইমোশনাল কথা শুনলে না... ডিসগাসটিং!' ছোটন কাজ করত একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে, পায়েলের বাবা একটা ছোট ছাপাখানার কর্মী ছিলেন। এই দুঃসময় এসে সব একাকার করে দিল।

দু দিন পরে মাঝরাতে হঠাৎ ফোন। ওপারে দীপ্তিদি। ফ্যাসফেসে, ঠাণ্ডা গলা— 'সেদিন কেন ফোন করছিলি বল।'

—'সে কিছু না, তুমি... তুমি ঠিক আছো তো? কে আছেন তোমার সাথে?'

—'কেউ নেই। মামা দিল্লিতে, আসতে পারে নি। পিসতুতো ভাই সেদিন এসেছিল, আজ সকালে

চলে গেল, কাজের দিন আবার আসবে। পাড়ার দু-একজন হেল্প করেছে। কাজটা তো ছোট করে হলেও করতে হবে, বাধ্য হচ্ছি ওদের হেল্প নিতে।'

—'এখন তো পারশিয়াল লকডাউন,... আমি কিন্তু যেতে পারি, কোন দরকার হলে...'

—'তুই অতদূর থেকে এসে কী করবি? বোকার মত কথা বলিস না। যাকগে, কী জন্য ফোন করেছিলি বল। স্কুলের কাজ নিশ্চয়? বল, বল... রাতে ঘুমোতে পারছি না, কাজ করি বরং। কাল থেকে ক্লাসও নেব।'

জোর করে নিজেকে শক্ত দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু দীপ্তিদির কথাবার্তা স্বাভাবিক লাগছে না মোটেই। ওর মনের ভেতরে ভাঙন ধরছে, আল্পনা বুঝতে পারে। জীবনে এই প্রথমবার, দীপ্তিদিকে একটু শাসনের সুরে বলে সে, 'না, তোমায় এখন ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি সামলে নেব। ক্লাস তুমি চাইলে নিতেই পারো, যদি বাচ্চাদের সাথে একটু সময় কাটালে তোমার ভাল লাগে, কিন্তু অন্য কাজের চাপ এখন তোমায় নিতে হবে না। তুমি একা আছ, খুব কষ্ট হচ্ছে জানি, কিন্তু... মেনে নিতে হবে দীপ্তিদি, কী করবে বলো!'

ওপাশ থেকে আবার বলে ওঠে অস্বাভাবিক কঠিন স্বরটা- 'জানি। এতদিন খুব সাবধানে থাকতাম, ভয়ে ভয়ে... আমার কিছু হয়ে গেলে বুড়োটার যদি... এবার যা খুশি করব, বাইরে বেরব, মাস্ক টাস্ক কিচ্ছু পরব না! করোনা হলে ভালই হয়, আর তো আমার কোন পিছুটান নেই...'

—'কী বলছ কী! ওসব বলতে নেই। শোন- আমি, তুমি, মালাদি, বস্তির বাচ্চাগুলো, পায়েলের বাবা, রাস্তার কুকুরগুলো... কেউ ভালো নেই দীপ্তিদি! একটা দুঃসময় চলছে আমাদের সব্বার... তবু তো আমাদের বাঁচতে হবে, একদম উল্টো-পাল্টা ভাববে না।'

—'বাপিও এইসব বলত, জানিস। মা চলে যাবার পর এইসব বলেই ভুলিয়ে রেখেছিল আমায়। দীক্ষা নিয়েছিল, খুব ভগবানে বিশ্বাস ছিল- বলত, কারও ক্ষতি না করে সৎ ভাবে জীবন কাটাচ্ছি, আমরা খারাপ থাকতে যাব কেন? ভাল মানুষদের পাশে কাউকে না কাউকে ঠিক

ঈশ্বর জুটিয়ে দেন।... এবার জবাব দিক, এই যে আমাকে একা করে দিলেন ভগবান, এবার আমি কী নিয়ে থাকব, কেন থাকব?'

—'প্লিজ তুমি এরকম কোর না। এরকম করলে কি উনি শান্তি পাবেন, বলো?'

—'আমি তো কোনদিনই বাপিকে সুখী করতে পারিনি। অনেক স্বপ্ন ছিল আমাকে নিয়ে, সেসব হতে পারিনি। তবে মুখ ফুটে কিছু বলত না। শেষ ইচ্ছেটাও পূর্ণ করতে পারিনি, জানিস! দুদিন আগে একটা গান শুনতে চেয়েছিল, ক্যাসেটে। অনেক আগে একটা জলসায় নিজেই লাইভ রেকর্ড করেছিল, সেটার ওপর আবার অটোগ্রাফ নিয়েছিল পরে। বলেছিল, তোদের ওই ইউটিউবে শুনব না, কানে লাগে। ওই ক্যাসেটটা খুঁজে দে। খুঁজে পাইনি, রাগ দেখিয়ে বলেছিলাম– সে কোন্ কালের জিনিস, কোথায় পড়ে আছে আমি এখন খুঁজতে পারব না অত। তার পর দিন থেকেই শরীরটা যেন বেশি খারাপ হয়ে পড়ল...'

—'কী গান গো?' আল্পনা জানতে চায়।

—'ওই যে, কি যেন– লহো লহো তুলে লহো..'

—'নীরব বীণাখানি, তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি...' আল্পনা খেই ধরে বলে ওঠে।

—'তুই জানিস পুরোটা?... কর তো।'

—'আ– আমি?"

—'হ্যাঁ কর। আমি শুনে শুনে তুলে নেব। তারপর বাপিকে শোনাব নিজেই। বাপির ফেভারিট আর্টিস্টের মত হবে না, তবু লাইভ তো হবে!'

দীপ্তিদির বাবা গান খুব ভালবাসতেন, জানে আল্পনা। গল্প করতে করতে তাকে একবার বলেছিলেন তাঁর যৌবনকালের অনেক পাগলামির কথা, রাতবিরেতে কোথাও জলসা হলেই নাকি শুনতে ছুটে যেতেন। সঙ্গে থাকত টেপ রেকর্ডার। লাইভ রেকর্ড করে আনতেন সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের গান। সেসব গল্প শুনতে আল্পনারও ভাল লাগত। দীপ্তিদি এখন যা চাইছে, এও এক ধরনের পাগলামি। কিন্তু তাই করতে হবে। না হলে ওর মন শান্ত হবে না। এইটুকু তো করতেই পারে আল্পনা। আস্তে আস্তে সে ধরে, 'লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি...'

গানটা তারও খুব প্রিয়। বহুবার শুনেছে সে। শুনে শুনেই মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ এভাবে কাজে লাগবে, কে জানত।

'পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে
পরশ দিয়ে সরস কর ভাসাও অশ্রুজলে...'

এ গান যতবারই সে নিজে শুনেছে, মনে হয়েছে এই জায়গাটায় এসে পাথর গলে কান্না বেরোতে চায় যেন, যা কিছু অসহায়, অসুন্দর, অসহনীয়– তার চরম বেদনা আশ্রয় খোঁজে সুরে সুরে, সুন্দরের কাছে– 'শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে,
আমার চিত্তমাঝে/শ্যামল রসের আঁচল তাহার
বক্ষে দেহো টানি/ ওহে সুন্দর হে সুন্দর।'
ওপারে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ, 'এই জন্যই তোকে এত পছন্দ করত রে। তোর সঙ্গে বাপির ভাললাগা, পছন্দ এতটাই মেলে... বলত প্রায়ই...'
কাঁদুক একটু। ওকে থামায় না আল্পনা।

দীপ্তি একটু সামলে নেওয়ার পর গানটা শেষ

করে আল্পনা বলে, তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর। কাল আবার ফোন করব।

ফোনটা রেখে জল খেতে ওঠে আল্পনা। দেখে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন।

—'কে?'
পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ায় ছোটন।

—'কি রে, ঘুমোস নি!' জানতে চায় আল্পনা।

—'ঘুম আসছে না। বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। তারপর শুনলাম তোর ঘর থেকে আওয়াজ আসছে। রাত দুপুরে কাকে গান শোনাচ্ছিলি?'

—'ভেতরে আয়, বলছি সব।'

অনেকদিন পর দিদির ঘরে এসে বিছানায় পা তুলে বসে ছোটন। আল্পনা সবটাই বলে। ছোটন মন দিয়ে শোনে। তারপর বলে, 'ডোন্ট লেট হার ডু এনিথিং র‍্যাশ। ওনাকে একটু দেখিস। দরকার হলে এভরি নাইট, একটু একটু করে... শি ইজ ইন আ ডিপ ইমোশনাল নিড অব সামওয়ান টু স্ট্যান্ড বাই হার।'

আল্পনা অবাক হয়ে তাকায়, 'তুই একথা বলছিস!'

—'হ্যাঁ রে। আর তোর কীসব কাজ আছে বলছিলি, আমি কিছুটা হলেও করে দেব।'

—'না না, তোর সময় নষ্ট হবে... তোর এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করা দরকার, কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো দিতে হবে তোকে...'

—'সে আমি করে নেব দি। তোর ওপরেও তো কম চাপ নেই। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড।... শোন না, আজ তোর কাছে শোব একটু? ঘুম পাড়িয়ে দিবি? ছোটবেলার মত!'

—'আয়, শুয়ে পড়।' ভাইয়ের চুলটা ঘেঁটে দেয় আল্পনা। আলোটা নিভিয়ে দেয়।
ছোটন বলে, 'একটা গান কর তো। বেশ লাগছিল।'

—'তোর পছন্দমত গান মানে তো... আমি তো সেরকম কিছু জানি না।'

—'এনিথিং সুদিং। একটু ঘুমোতে চাই রে। কতদিন ঘুমোতে পারি না, জানিস!'
আল্পনা চোখের কোণে আসা জলটা চট করে মুছে নেয়। তারপর গুনগুন করে একটা সুর লাগায়, অনেক ছোটবেলায় শোনা, ভালোলাগা একটা গানের সুর— 'ঘুম যায় ওই চাঁদ...'

ছোটন দিদির বিছানায় আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। হয়ত কাল সকালে উঠে এই রাতটাকে ভুলে যেতে হবে, আবার ঘাড়ে এসে পড়বে দুঃসময়ের রোজনামচার থাবা... তবু, এভাবেই তো চলতে হবে। এই পাশে থাকার, ভালোবেসে থাকার মুহূর্তগুলো কি একেবারেই অলীক, ছায়ার পাখি?

আল্পনারও ঘুম আসছে।

গল্প

ক্ষত

কুমকুম বসুদাস

আমার ডাইনিং রুমের আয়নাটা খুব সুন্দর। বাবা বলতেন, ‘বেলজিয়ামের কাচ। যত্ন করিস’। মুছি কলিন্স দিয়ে। একটু ঘষাতেই চকচককরে। ওতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বগুলো যেন কথা বলে। মেহগনি ব্রাউন ফ্রেমটা ওর জৌলুস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রচুর গেষ্ট আসে আমার বাড়িতে। খানাপিনা লেগেই থাকে। সুক্তি –শশাঙ্ক, অমল–মঞ্জু, কাবেরী–স্নেহাশিস, আরও কত কে। আমি

আয়নার সামনে বসে দেখি ওদের হাসিঠাট্টার প্রতিচ্ছবি গুলো। আনন্দে উল্লাসে ভরে ওঠে ঘরটা।

এমন সময় মোবাইলটা বেজে ওঠে। ডিসগাষ্টিং। এমন আনন্দ-মুহূর্তেকে রসভঙ্গ করতে চাইছে। সুইচ অফ করে দিই। অনভিপ্রেতর কণ্ঠরোধ করার মধ্যে বেশ একটা বিজয়ীর উল্লাস আছে। দেখি আয়নায় আমার উল্লসিত দৃষ্টির প্রতিফলন।

মাত্র দু পেগ। তাতেই উত্তেজিত আমি। আয়নার ভাষা পড়তে পারি এই আধধরা নেশাতেই। রাত বাড়ে। এবার গুডনাইটের পালা। একে একে চলে যায় সবাই।

আয়নাটা পড়ে থাকে একভাবে। আমাকে কাছে ডাকে ইশারায়। চোখ আধঘুম। নেশায় বিভোর আমি। আবার ফোনটা বাজছে। আবার সুইচ্ অফ। আয়নায় পড়ে প্রতিবিম্ব। কুসুম! সিক্ত চোখ, খোলা চুল, সাদা শাড়ি। পিছন ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই। আয়নাটা তুলে এক ঘুষিতে আছাড় মারলাম। বিকট শব্দে উপুড় হয়ে পড়ল সে। মনে পড়ল বাবার কথা— 'যত্ন করিস'।

দু'হাতে সোজা করে তুলে দেখি, একটা বড় স্ক্যার্চ পড়ে গেছে। কুসুমের প্রতিবিম্ব দু'ভাগে। ওর জলভরা চোখ দুটো সস্নেহে মুছিয়ে দিলাম। মাথায় বুলিয়ে দিলাম হাত। ভাঙা কাচের ঘষায় হাত হল রক্তাক্ত। সে রক্তের ধারাগড়িয়ে পড়ে রাঙিয়ে দিল কুসুমের সিঁথি।

বেঙ্গল টাইমস

ভৌতিক থ্রিলার

‘ও’ পিশাচ

ডা. সৌম্য গায়েন

১

অমাবস্যার ৫ দিন আগে

বাপন বললো,-

-‘ওস্তাদ!খবর আছে আজ লোহাবোঝাই মালগাড়িটা লেট আছে। সামনে শহরের দিকটায় লেভেল ক্রসিং-এর কাজ হচ্ছে। গাড়িটা আমাদের গ্রামের কাছে প্রায় আধঘণ্টা তো দাঁড়াবেই।’

-‘ঠিক বলছিস?’

-‘ঠিক মানে! পাক্কা খবর। ধরে নাও কাঁচি করে ফেলেছি’।

গ্রামের যে দিকটায় হাট বসে সেখান থেকে জঙ্গলের দিকে যে প্রায় নিশ্চিহ্ন পায়ে চলা পথটা চলে গেছে সেই পথের ধারেই নান্টুর বাড়ি। ও দিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা। নান্টুর ছোটো একটা গ্রীলের কারখানা আছে। এমনিতে নান্টু খুব সাহসী ছেলে। পড়াশুনায় মাধ্যমিক পাশ হলে কি হবে খেলাধুলায় নান্টুর বরাতে সবসময় গোল্ড মেডেল। কিন্তু নান্টু আসলে একজন ওয়াগন- ব্রেকার। নান্টু জানে, পড়াশুনাই করো, কি খেলাধুলা; টাকা রোজগার করতে প্রচুর হ্যাপা। পরিশ্রম করো, তেল দাও, লোকের রাজনীতির শিকার হও, সঙ্গীর লেঙ্গি খাও, তারপর হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে একটা জায়গায় পৌঁছতে প্রচুর হাঙ্গামা। তারচেয়ে এই ভালো। গ্রীলের টুকটাক ব্যবসা আর কয়েক কিলোমিটার দূরের রেল লাইনে আসল ইনকাম। ভয় কাকে বলে নান্টু জানেনা। ওদের পাঁচ জনের গ্যাংটা

গভীর রাতে যখন হাড়মুড়মুড়ির জঙ্গলের ভেতর চোরাই মাল রেখে ফিরে আসে, তখন মাঝরাত। অত রাতে হাড়মুড়মুড়ির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ফেরা আর শ্মশানযাত্রা- সাধারণ লোকের কাছে একই ব্যাপার। অথচ নান্টুর কাছে এ হল জলভাত। আজও লাভ হয়েছিল ভাল। ফিরতে ফিরতে ওরা পাঁচজনই খুব নেশা করে ফেলেছিল। নান্টু বলল,

- 'এই তোরা এগো' আমি একটু ঢেলে আসছি'।

- 'একি রে! ওস্তাদের এর মধ্যে হিসি পেয়ে গেল? এখনও তো আরও দু--বোতল·····'। হাসতে হাসতে বাপন গড়িয়ে পড়ে ন্যালার গায়ে। একটা ঘন হয়ে আসা ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে নান্টু। প্যান্টের চেনটা সবে খুলেছে, এই সময় আবছা একটা খস্খস্ শব্দ হয় ঝোপটার পিছনে। ঈষৎ ঘোলাটে হয়ে আসা চোখে নান্টু তাকায় সেদিকে।

- 'কে রে?'

কোনও উত্তর আসেনা। খালি পিছনের অন্ধকারটা জমাট বেঁধে লম্বা হতে থাকে। আর অন্ধকার থেকে নান্টুর দিকে তাকায় দুটো জ্বলন্ত চোখ। নান্টুর আর কিছু মনে থাকেনা।

****

২

- অমাবস্যার ৪ দিন আগে

স্কুল ছুটির পর মাঠে গল্প করছিল তিয়াসা। বড্ড গরম পড়েছে আজ। দুখু মিঞার জলার উপর দিয়ে বয়ে আসা হাওয়াটাও কেমন ভ্যাপসানো লাগছে। জলার ওপারে হাড়মুড়মুড়ির জঙ্গল। এই শেষ বিকেলে জঙ্গলটা যেন থম মেরে আছে কিছুর অপেক্ষায়। জলা আর জঙ্গলের ধার দিয়ে তিরতিরিয়ে কোনওক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে ভবানী খাল। কতদিন আগে ওখানে একটি নদী ছিল নাকি! এখন বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর। তিয়াসা জানে ওই হেজে মজে যাওয়া খাল আর জঙ্গলের গা ঘেঁষে একটা অদ্ভুত নেড়া জায়গা আছে। আর সেই জায়গাটার দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো ঘটনাটা। ফাঁকা জমিটার দক্ষিণে যে জবা গাছটা আছে- সেই গাছটায় ফুল ফুটেছে। জবা গাছে জবা ফুল ফুটবে – এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তিয়াসা অবাক হয়ে দেখল অনেকগুলো রক্তজবার মধ্যে একটা ফুল আলাদা। খুব, খু-উ-ব আলাদা। জবা ফুলটার রঙ- কালো। হ্যাঁ, বিলকুল কালো।

৩

- অমাবস্যার ৩ দিন আগে

প্রতিদিন খুব ভোরে ওঠে অণিমা। কাজ কী কম আছে সারাদিনে! সকালে উঠে গোয়ালে গরুর জাবনা দাও রে! উনুন ধরিয়ে তাতে প্রথমে চা বসাও রে! চা খেয়ে গরুগুলোকে মাঠে বেঁধে আসো রে! এসে স্নান করে-টরে তারপর যজ্ঞি-বাড়ির রান্না। শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, জা, দেওর, ননদ, স্বামী, ছেলে, মেয়ে - সব মিলিয়ে মানুষ তো কম নেই রে বাবা! তা ধরতে গেলে জনা বারো-তেরো তো হবেই। অণিমা যদি না করে, তাহলে আর করবেটা কে? আজও চোখ মুছতে মুছতে দাওয়ায় আসে অণিমা। সবে ভোরের আলো ফুটেছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে জলার দিকটা থেকে। বসন্তের স্নিগ্ধতা যেন অণিমার চোখে-মুখে চাপা খুনসুটিতে ভরিয়ে দিচ্ছে। মুখ হাত, পা ধুয়ে অণিমা গোয়াল ঘরের দিকে এগোয়। 'কান্তা' খুব ডাকছে আজ। কে জানে গরুটার খুব খিদে পেয়েছে হয়তো। 'কান্তা' আর 'পান্তা'- অণিমার খুব কাছের, খুব প্রিয়। দিনের শেষে অণিমা যখন গরুদুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, ওদের চোখ যেন জুড়ে আসে আচ্ছন্নতায়। অণিমা বাপের বাড়ি গেলে গরুগুলো দুধ তো দিতে চায়ই না, উলটে খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়।

- হ্যাঁ রে মা! দাঁড়া দাঁড়া। এই তো আমি আস্……’

গোয়ালঘরের দরজাটা খুলে পাথর হয়ে যায় সে। অভিভূত অণিমার সামনে তারস্বরে ডেকে চলেছে ‘কান্তা’। আর ‘পান্তা’ নেই। কোথাও নেই। পান্তার থাকার জায়গা জুড়ে পড়ে আছে রক্ত, চাপ চাপ রক্ত। অণিমা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়।

৪

- অমাবস্যার ৩ দিন আগে

গ্রামের আটচালায় মা ভবানীর মন্দির। কথিত আছে এই মন্দির নাকি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলার রাজা বল্লাল সেনের জায়গীরদার শক্তি সেন। শক্তি সেন ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী। তখন বাংলায় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত বিপরীতমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। বাংলায় তখন বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পালা। এর আগে পাল বংশের শাসনের আগে ও সময়ে বিভিন্ন আক্রমণের মুখে বৌদ্ধধর্মকে অনেকটাই গুপ্ত ও আন্তর্ভৌম ভাব ধারণ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন প্রান্তিক জনজাতির ধর্মকৃত্যগুলি ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করছিল। তার ওপর ইতিমধ্যেই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীয় পোন ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে। ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করেছিল ভয়ঙ্কর সব দেব-দেবীর মূর্তি এবং বিচিত্র পূজা পদ্ধতি। কালের পাকেচক্রে সেন বংশের শাসনে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের মধ্যগগণে বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখা, কালচক্রযান ও সহজযান-এর কিছু কিছু ক্রিয়াপদ্ধতি হিন্দু তন্ত্রসাধনায় অঙ্গীভূত হতে শুরু করে। শুরু হয় বিচিত্র সব তান্ত্রিক প্রথা, তান্ত্রিক পূজা, তান্ত্রিক মূর্তি ও তন্ত্রশাস্ত্র রচনা। এরই মধ্যে শক্তি সেন যুদ্ধ শুরু করেন মুসলমান আক্রমণকারী কাফিল খানের বিরুদ্ধে। কাফিল খান ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তার সৈন্যদলের ছিল শ্বাপদের গতি আর হিংস্রতা। বারবার পরাস্ত হচ্ছিলেন শক্তি সেন। পিছু হটতে হটতে অধুনা নদীয়া জেলার তেহট্টের কাছে এই গ্রামটিতে আশ্রয় নেন শক্তি সেন। অকস্মাৎ জলের ধারে তাঁর দেখা হয় একটি ভবঘুরে ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় হতশ্রী হওয়া পরিবারটিকে রক্ষা করেন শক্তি সেন। সেই পরিবারের কর্তা ছিলেন শুভ্রসত্বত্তম ভট্টাচার্য। তন্ত্রসাধনায় তাঁর ছিল এক আশ্চর্য জ্ঞান। শক্তি সেনের উপকারের প্রতিদানে শুভ্র প্রতিষ্ঠা করেন- মা ভবানীর মন্দির। কিছু অদ্ভুত ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় মায়ের পদযুগলের দুটি মধ্যমা এবং হাতে ধরা নরমুন্ড থেকে সৃষ্টি করেন একটি অমানুষিক পৈশাচিক অবয়ব- একটি শক্তি। শুভ্র ভট্টাচার্যের আজ্ঞাবহ সেই পিশাচ মাত্র দশ দিনে কাফিল খানের সৈন্যদলকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

তারপরের ইতিহাস অত্যন্ত ক্ষীণ, ফ্যাকাসে। শক্তি সেন আরো পনেরো বছর সুখে রাজত্ব করেন। মা ভবানীর এই মন্দিরে বংশানুক্রমিক যজমান হন ভট্টাচার্য বামুনেরা। আর যেমনভাবে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল তেমনই হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায় সেই পিশাচ। কি করে?- কেউ জানেনা। সকালে মন্দিরের দরজা খুলে মায়ের পূজার জন্য রক্তজবার মালা গাঁথছিলেন নরোত্তম ভট্টাচার্য। সামনেই অমাবস্যা। মায়ের মহাপূজো। অনেক কাজ বাকী। হঠাত তাঁর চোখ পড়ে মায়ের পায়ের দিকে। দেখেন মায়ের পায়ের দুটি মধ্যমা নেই। কেবল পড়ে আছে দুটি জবা ফুল। তাদের রঙ কালো।

৫

- অমাবস্যার ২ দিন আগে

তেহট্টে শ্বশুরবাড়ি প্রভাতের। একমাত্র মেয়ে মণিমালাকে সেই ১০ বছর আগে প্রভাতের হাতে তুলে দিয়ে অলোকবাবু বলেছিলেন,-

- বাবা! আমার সব কিছু তোমার হাতে তুলে দিলাম। আর কিছু পারো না পারো ওর

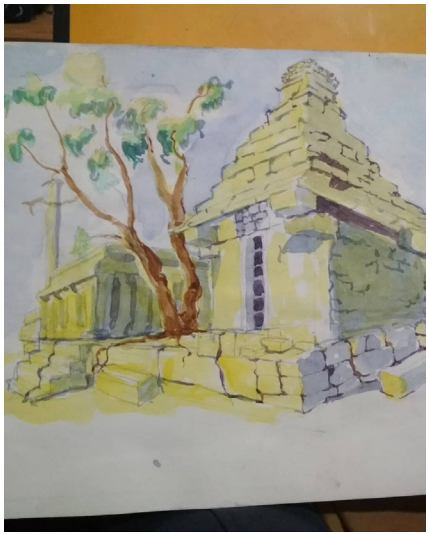

একটু যত্ন নিয়ো বাবা'।

তা, প্রভাত বৌকে বেশ ভালোই বাসে। বাজার--টাজার করা, পূজো পার্বনে উপহার দেওয়া মেলা-টেলায় নিয়ে যাওয়া তো আছেই; এসব ছাড়াও প্রভাত মাঝে মাঝে পছন্দমতো রান্নাও করে। বিশেষ করে পাঁচ বছর আগে মণিমালার কোলে যখন রনি এলো তখন প্রভাতের খুশি আর ধরেনা। গোড়া থেকেই শ্বশুরবাড়িতে খুব আদর প্রভাতের। এখন রণির দুষ্টুমির ঠেলায় সেই আদর আরো বেড়েছে। অলোক আর তন্দ্রা তো আদরের নাতিটিকে প্রতিমাসে না দেখলে-থাকতেই পারেন না। চালের ব্যবসায় যতই কাজ থাক, তাই প্রভাতকে সবকিছু ফেলে মাসে একবার শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। এবারও দিন তিনেক আগে তেহট্টে এসেছিল ওরা। গ্রামের বাড়িতে প্রভাতের বাবা-মা রয়ে গিয়েছিলেন। প্রভাতের এক তুতো সম্বন্ধী এসেছিলো তেহট্টে। দিন তিনেক হই-হল্লা করে, আড্ডা মেরে ওদের সময়টা ভালই কেটে গেলো। দুপুরের খাওয়া খেয়ে বাসে উঠে উঠতে বিকেল। গ্রামের থেকে ২ কিমি দূরে বাস স্টপেজে প্রভাতরা যখন নামলো- তখন রাত ৯টা বাজে। ওসমান মিঞা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ-পত্তর গাড়িতে তুলেই টাঙ্গাটায় উঠে বসে।

- 'বাবু! একটু তাড়াতাড়ি চলেন বাবু। দিনকাল ভালো নয়'।
- 'কেন? আবার ডাকাতি শুরু হলো নাকি? এদিকে তো ডাকাত নেই ওসমান!'
- 'ডাকাতি লয় বাবু! গ্রামে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটেছে। মনে হয়····· তেঁনারা'।
- আঃ! ওসমান! যত্ত সব বাজে কথা'।

প্রভাত উড়িয়ে দেয়। রাতের ঘনায়মান অন্ধকারে মণিমালার মুখটা দেখা যায় না। রণি ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রভাতের হাসির উত্তরে ওসমান মিয়াঁর গলা থেকে একটা 'ঘোঁত' শব্দ বেরোয় শুধু। এক কিমির বেশি গিয়ে জলা আর জঙ্গলের শুরুর দিকে হঠাত দাঁড়িয়ে যায় গাড়িটা। বিরক্ত হয়ে প্রভাত প্রশ্ন করে,-

- 'আবার কি হলো? এই তো বললে তাড়াতাড়ি যেতে হবে'।
- 'গাড়ি আর যাবেনা, বাবু' ঘড়ঘড়ে গলায় ওসমান উত্তর দেয়।
- 'মানে?'- লাফিয়ে নামে প্রভাত। টিমটিমে তারাদের আলোয় অবাক হয়ে প্রভাত দেখে ওসমানের শরীর তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। জলার উপর ক্রমশ লম্বা হয় ওসমানের ছায়া। এবার পুরো ১৮০০ ঘোরে মাথাটা। প্রচণ্ড বিস্ময়ে, ভয়ে আর আতঙ্কে প্রভাত দেখে এ তো ওসমান নয়। এ হলো··· এ হলো··· নামটা মনে পড়তে পড়তে সেই ক্রুদ্ধমূর্তি বীভৎস হিংস্রতায় প্রভাত সেনের মুণ্ডুটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে থাকে।

৬

- **অমাবস্যার ১ দিন আগে**
- গ্রামে এসব কী হচ্ছে বলতো বৌমা?'
- 'কি জানি! আমার কিন্তু খুব ভয় করছে, কাকীমা'। - ঘোষগিন্নির প্রশ্নের উত্তরে অণিমা শুকনো গলায় বলে।

- ‘একটা বিষয় লক্ষ্য করেছো বৌমা? মা ভবানীর মন্দিরে যেদিন থেকে ঠাকুরমশাই মূর্তি আর জবাফুলের ব্যাপারটা দেখেছেন তারপর থেকেই যেন অশৈলী ব্যাপারগুলো ঘটছে’।

- ‘তারপর থেকে কি বলছেন কাকিমা। সেইদিনই তো সকালে আমার ‘পান্তা’কে দেখতে পেলাম না। দুপুরে ঠাকুরপো খবর আনলো হাড়মুড়মুড়ির জঙ্গলের ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় নাকি একটা গরুর নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বের করে, খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিয়ে····· উফ্’।– গলা বুজে আসে অণিমার।

- প্রথমে তো সবাই ভেবেছিলো কোনো হিংস্র জন্তু-টন্তু হবে। কিন্তু প্রভাতদের ঘটনাটার পর····· কি সাংঘাতিক! তিনজনকে এবং ওসমানকে এমনভাবে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়েছে যে চেনা যায়না। কিন্তু; ও কে?’

অণিমা কোনো উত্তর দেয় না। গোটা গ্রামটা যেন কোনো অনাগত মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় থম মেরে গেছে। এক বিস্তীর্ণ, নিঝুম, নিস্তব্ধতা যেন। সন্ধ্যে নামতেই আটচালার আড্ডা বন্ধ। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে তাড়াতাড়ি। পথে মানুষ নেই, বাড়িগুলিতে শব্দ নেই, এমনকি চরাচরে অন্য কোনো প্রাণীর আওয়াজও নেই। এরই মধ্যে একটা কথা মনে পড়তেই কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে যায় অণিমা। পরিবর্তনটা যে তিনদিন আগেই দেখেছিল। লক্ষ করেছে ২ দিন আগে। হঠাৎ করেই তিয়াসার দুষ্টুমিগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে যেন। দিনের অধিকাংশ সময় কি রকম অন্যমনস্ক থাকে মেয়েটা। সেদিন হঠাৎ ওর চোখদুটোর দিকে তাকাতেই শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গিয়েছিল। এ কি দেখছে সে! আট বছরের মেয়ের চোখ অতটা গভীর, অতটা লাল কি করে হতে পারে! পরিবর্তনটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ছিল। অণিমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ভুল দেখল নাকি!

- ‘ও মা! কি তাকিয়ে আছো অমন করে! খেতে দাওনা। খিদে পেয়েছে’।

তিয়াসার কথায় চমকে ওঠে অণিমা। কই! কিছু নেই তো। কিন্তু একটু আগেই তো ক্রুদ্ধ তিয়াসার কথায় চমকে ওঠে অণিমা। কই! কিছু নেই তো। কিন্তু একটু আগেই তো ক্রুদ্ধ আয়ত আননে যেন সবকিছু ভস্ম করে দেবে। কি তীব্র, মর্মভেদী, রক্ত প্লাবিত দৃষ্টি! আরো একটা ব্যাপার! অণিমা কাউকে কিছু বলেনি। সিতেশকেও না। ২ দিন থেকে মাঝরাতে একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা অল্প ফাঁক হয়। বিছানা থেকে একটা ছায়া উঠে যায় দরজার দিকে। অণিমা শ্বাস বন্ধ করে থাকে। ছায়াটা প্রায় ভেসে ভেসে দরজার বাইরে উঠোন দিয়ে নেমে যায়। অণিমা লক্ষ্য করে বাড়ির বাইরে যাচ্ছে তিয়াসা। হাতে ধরা বাগানের ডাব পাড়া কাটারিটা।

৭

- **অমাবস্যার দিন; সকালে**

গ্রামের আটচালায় সভা বসেছে। বড় বড় মাথারা রয়েছেন। রয়েছেন স্থানীয় থানার দারোগা বাবুও। পুলিশ অবশ্য সমস্ত মৃত্যুকেই কোনও হিংস্র বন্য জন্তুর কাণ্ড বলেছে। তবুও ভবানীর মন্দিরের পাশে বৈশাখের মহা অমাবস্যার মেলা বন্ধ, এমনকি পুজোও বন্ধ থাকবে জেনে আইন-রক্ষকরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। স্বয়ং এম.এল.এ. সাহেব খবর নিয়েছেন। পাবলিক ইন্টারেস্টের ব্যপার। আজকের মিটিং-এ একটা পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্যই দারোগা তাপস খাঁড়া উপস্থিত আছেন। হাইস্কুলের মাস্টারমশাই মাখনবাবু গলা খাকরানি দিয়ে শুরু করলেন,-

- ‘তাহলে? সবাই কী বলছেন? আমাদের কর্তব্যটা কী?’

- ‘কর্তব্য আর কী? পিশাচটাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব’।– নান্টু ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

যেদিন জঙ্গলে অজ্ঞান হয় যাওয়ার পর থেকে নান্টুর সঙ্গী বাপন আর ন্যালা বেপাত্তা। নান্টুর মেজাজ আগুন হয়ে আছে।

- 'অলম্বুষের মতো কথা বলো না, নান্টু! কাল রাত্রে পাঁচজনের গোটা সার্চ পার্টিটাই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ল্যাজা, মুড়ো অবধি চেনা যাচ্ছে না। বাস ওঠাতে হবে, বুঝলে হে! এ গ্রামের বাস ওঠাতে হবে। এ পিশাচের সাথে এঁটে ওঠা মানুষের কম্ম নয়'।– ঘোষবাবু বিলাপ করে ওঠেন।

- 'আপনি থামুন তো মশাই! সাহস না থাকলে কাকীমার আঁচলটা দিয়ে ঘোমটা পরে পালিয়ে যান। যত্তসব ক্ষয়াটে বুড়োর দল'। নান্টু তড়পায়।

- 'ওরে সেদিনের পোলাপান! আমাদের ক্ষয়াটে বুড়ো বলা……!'- হৈ হৈ করে ওঠেন ঘোষবাবু, দাসবাবুরা। যৌবনের অপরাহ্ন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের আঙিনায় প্রবেশ করা মাখনবাবু উঠে দাঁড়ান। মাখনবাবুর মাথা চিরকালই ঠাণ্ডা।

- 'আঃ! কি হচ্ছেটা কী? অ্যাই নান্টু। চুপ কর। অতিরিক্ত, অবুঝ সাহস হঠকারিতার সমান। আর ঘোষবাবু! শুধু হতাশ হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করলে হবে! মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন- শেষ চেষ্টা করে দেখবো। কিন্তু! আমার একটা খটকা আছে'। মাখনবাবু চুপ করতেই ভীড়টা আকুল হয়ে বলে ওঠে,-

- 'কী, মাষ্টারমশাই। কী?'

- 'আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, যেদিন মা ভবানীর পায়ের দুটি মধ্যমার জায়গায় দুটি কালো জবা দেখেছিলেন ঠাকুর মশাই, পিশাচটার হত্যালীলা শুরু হয়েছে তার আগেরদিন রাত থেকে। তারপর যত অমাবস্যা এগিয়ে আসছে তত বাড়ছে তার রক্তক্ষুধা। প্রথমে প্রভাতদের তিনজন ও ওসমান মিয়াঁ- এই চারজন। তারপর সার্চ পার্টির পাঁচজন এবং··· এবং··· আপনারা হয়তো জানেন না কাল রাত থেকে মোড়ল মশাইও নিখোঁজ। আমার মনে হচ্ছে মা ভবানীর মন্দিরের ইতিহাসের সাথে এই ঘটনার একটা কিছু যোগ আছে। এ সম্পর্কে ভটচায্মশাই কিছু আলোকপাত করতে পারেন কি?'

আটচালার এক কোণে চুপ করে বসে এতক্ষণ সবার আলোচনা শুনছিলেন নরোত্তম ভট্টাচার্য। আস্তে আস্তে বলে ওঠেন,-

- যেদিন মায়ের পায়ে ঐ অলক্ষুণে কাণ্ডটা দেখি, সেদিনই আমার মনে কু ডাকছিল। বাড়ি ফিরে বাবাকে জিজ্ঞেস করি। আপনারা জানেন,- আমার বাবা, দ্বিজোত্তম ভট্টাচার্যের বয়স পঁচানব্বই। এই বয়সে তিনি ভাল করে শুনতেও পান না। বা সবকিছু মনেও রাখতে পারেন না। তবু অনেক চেষ্টা করে বাবার কাছ থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তা বলছি'। - একটু থেমে ভটচাজ্ মশাই ফের শুরু করেন,-

- 'কাফিল খাঁ এবং তার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবার পর শক্তি সেন শুভ্রসত্ত্বত্তম ভট্টাচার্যকে ডেকে এই গ্রাম ও চার পাশের আরও পাঁচটি গ্রাম তার নামে লিখে দিতে চান। শুভ্রসত্ত্বত্তম এই জায়গীরদারী অস্বীকার করে বলেন- তিনি সামান্য ব্রাহ্মণ মানুষ। মন্দিরের সেবায়েত হয়ে থাকতে পারলেই তিনি ও তাঁর পরিবার খুশি। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। গোল বাঁধলো তাঁর সৃষ্ট অমিত শক্তির আধার সেই পিশাচকে নিয়ে। আপনারা জানেন শক্তির বিনাশ করা প্রায় অসম্ভব। শুভ্রসত্ত্বত্তম মহাষটিক্র-য়ার মন্ত্রে আবদ্ধ করে সেই পিশাচকে কালের গর্ভে অন্তরীন করে রাখেন। কিন্তু শক্তি সেনের মতো প্রায় কেউই জানতেন না যে মৃতদেহের উপর শবসাধনা করে তিনি সেই পিশাচকে সৃষ্টি করেন। সেটা ছিল কাফিল খাঁর এক অতি অত্যাচারী, মহাক্রোধী হিন্দু সেনাপতির মৃতদেহ। ঐ সেনা-পতিকে শুভ্রসত্ত্বত্তম গোপনে হত্যা করেছিলেন

তাঁর পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার্থে। শুভ্রসত্ত্বত্তম ত্রিকালদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর মন্ত্রের জোর একদিন ফুরিয়ে যাবে। প্রায় চারশো বছর পর কালের অন্তর্জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে সেই পিশাচ। এতদিন অভুক্ত থাকার পর তার নিঃসীম ক্ষুধা আরো সর্বগ্রাসী হয়ে আত্ম-প্রকাশ করবে। আর তখন কোনো তন্ত্রমন্ত্রের শক্তিই তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সে প্রথম ধ্বংস করবে যার রক্ষার্থে তার সৃষ্টি সেই শক্তি সেনের বংশধরদের। তারপর গোটা গ্রাম। আর অমাবস্যার দিন সে যখন গ্রামের সেবায়েতকে হত্যা করবে তারপর থেকে এই ভবানীগঞ্জে বাপ--পিতেমোর ভিটেতে বাতি দেবার জন্য একটা লোককেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কুকুর আর শকুন ছাড়া কোনো প্রাণীর ছায়াও ছোঁবেনা এই মাটি'।– ভট্টাচার্য মশাই থামার পর আটচালায় পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। শুধু সাহসী নান্টু অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। অনাগত ভবিষ্যৎ প্রত্যেকের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। শুধু মাখন মাস্টার অস্ফুটে আপন্মনেই বলে ওঠেন,-

- 'কিন্তু কোনও উপায়-ই নেই?'
- 'বাবা বলেছেন – একমাত্র মা ভবানীই পারেন আমাদের রক্ষা করতে'।– ভটচায্ উত্তর দেন।
- 'তার মানে?'- অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন মাখনবাবু।
- 'আমি জানি না'।

৮

- **অমাবস্যার দিন; রাত্রে**

আজ মহা অমাবস্যার দিন মা ভবানীর মন্দিরে মহা ধূমধাম করে পূজো হবার কথা ছিল। কিন্তু সকলের সেই আলোচনার পর গ্রামের কেউই আর বাড়ির বাইরে থাকার ঝুঁকি নেয়নি। ভক্তির চেয়ে ভয়ের দাম বেশি। গত চারশো বছরের মধ্যে এই প্রথমবার নিষ্প্রদীপ থাকবে

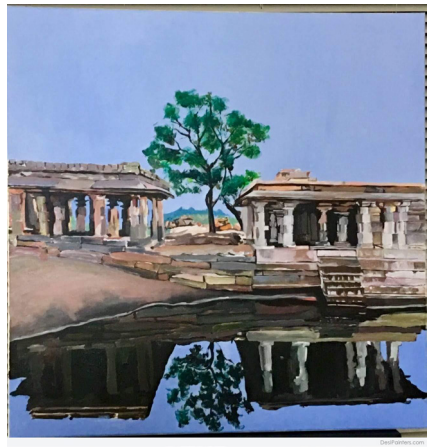

মা ভবানীর মন্দির; এই মহাঅমাবস্যায়। মাঝরাত শেষ হয়েছে কি হয়নি, একটা শনশন হাওয়া উঠল। তারই মধ্যে সীতেশের মনে হল কে যেন দূর থেকে মেয়েলি গলায় একবার 'আয়, আয়, আয়' করে ডেকে গেলো। সকালের সেই আলোচনার পর বাড়ি ফিরে অণিমা সব বলেছিল সীতেশকে। আজ রাত্রে সবকিছুর শেষ দেখে ছাড়বে সীতেশ। তিয়াসা তার হৃদয়ের টুকরোগুলো জুড়ে তৈরি। তাকে সে কিছুতেই পিশাচিনী হয়ে যেতে দেবে না। চোখ বুজে শুয়ে আছে সীতেশ। বড় ঘড়িটায় ঢং করে একটা শব্দ হল। রাত একটা। এইবার বিছানায় একটা মৃদু নড়াচড়া টের পায় সে। ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল। তিয়াশা উঠছে বিছানা ছেড়ে। মাঝেতে লাফিয়ে নামল। ঝুং করে শব্দ হল নূপুরের। মিনিট তিনেক অপেক্ষা। সীতেষ নিঃসাড়ে উঠে পড়ে। সারা বাড়ি চুপচাপ, কোথাও কোনও শব্দ নেই। উঠোনের দিকটায় আসতেই ঝুং ঝুং শব্দটা মিলিয়ে যায়। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল তিয়াসা। সদরের দিকে যেতেই দুটি ছায়া মূর্তি বেরিয়ে আসে অন্ধকার থেকে। নান্টু আর মাখন মাস্টার। নরোত্তম ভট্টাচার্যকে বলা আছে – মা ভবানীর মন্দিরে থাকবেন।

ফিস্ফিসিয়ে বলে নান্টু-

- ‘জলার দিকে যাচ্ছে’।

- ‘কি সর্বনাশ! ঐদিকেই তো মায়ের মন্দির!’ – আর্তনাদ চেপে মাখনবাবু বলেন। শিকারে বেরিয়েছে তিয়াসা? বুকটা ধক করে ওঠে সীতেশের। তার কলিজা; তার নয়নের মণি; তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়; তার একমাত্র কন্যা- তিয়াসা!- পিশাচ? ভেতরের ধাক্কাটা সামলে চোয়াল শক্ত করে সীতেশ।

- ‘অস্তর কিছু নিয়েছো?’

নান্টু নিয়েছে লম্বা একটা ছুরি আর মাখন বাবু নিয়েছেন লোহায় বাঁধানো একটা লাঠি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওরা মনস্থ করে রাস্তাটা যেদিকে বেঁকে ঘোষেদের পুকুরের পাশ দিয়ে গেছে সেইদিকেই যাবে। কিছুটা গিয়ে হাতের টর্চটা একবার জ্বালিয়েই বন্ধ করে সীতেশ। সেই টর্চের আলোয় সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে

মাখনবাবু দুটি জিনিস দেখতে পান। এক নম্বর; দু-পাটি নূপুর কে যেন খুলে রেখে গেছে রাস্তার উপরে। তাতে আবার সিঁদুর মাখানো। দুই নম্বর; মাটিতে পায়ের ছাপের পাশে পাঁঠার হাড় ও রক্ত। আজ রাত্রে তাহলে কচি পাঁঠা দিয়ে শুরু করেছে পিশাচটা। রাস্তাটা গেছে মা ভবানীর মন্দির ছুঁইয়ে জলা আর জঙ্গলের দিকে।

মাখনবাবুর মনে হচ্ছিল টর্চের আলোয় আরও একটা কী দেখলেন; কিন্তু সেটা যে কী কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা টের পাচ্ছিল পচা রক্ত-মাংস মেশা গন্ধটা ধীরে ধীরে বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে মিশছে। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরে বাঁ পাশে একটা বড়ো আশ-শ্যাওড়ার ঝোপ এলো। সেটার পরেই খেলার মাঠ। তারপর মন্দির। মন্দিরের পিছনেই খাল, জলা আর চঙ্গল। মন্দিরে লুকিয়ে থাকার কথা নরোত্তম ভট্টাচার্যের। এখান থেকেই ওরা দেখতে পেল একটা ছায়ামূর্তি রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নামছে। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সেই কালো ছায়াটির অবয়ব চিনতে ভুল হয় না ওদের। ওটা তিয়াসা। কিন্তু তিয়াসার হাতে ওটা কি? তিনজনেই চট করে আশশ্যাওড়ার ঝোপের পিছনে সরে আসে। ধীরে ধীরে পিছু নিতে হবে তিয়াসার। বিন্দুমাত্র শব্দ হলেই সর্বনাশ। ঠিক এই সময়ে পিশাচের গায়ের গন্ধটা যেন এই অন্ধকারের মতোই দপ করে বেড়ে উঠল। প্রবল বেগে বমি উঠে আসতে চাইল ওদের। যদিও তিয়াসার দিক থেকে নজর সরাচ্ছিল না কেউ। তিয়াসাও যেন মাঠে নেমে একটু থমকে দাঁড়ালো। শিয়াল যেমন নাক উঁচিয়ে বাতাসে গন্ধ শোঁকে ঠিক সেইভাবে মাথে উঁচু করে সেইভাবে গন্ধ শুঁকতে লাগল। নিজের বুকের ধক্ ধক্ শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল সীতেশ। কী শুঁকছে তিয়াসা? তাদের গায়ের গন্ধ? তার অতি আদরের মেয়ে; যাকে একটা জন্মত্রুটি সত্ত্বেও সে বুকে আঁকড়ে ধরে আকণ্ঠ চুম্বন করে; সে খাবে তার বাবাকে? পিশাচিনী? সীতেশের পিঠটা খামচে ধরেন মাখনবাবু। ঠিক সেই সময় একটা অঘটন ঘটে গেল। একটা কাঁটাঝোপে পা পড়তে ‘আহ্’ শব্দ করে উঠলেন মাখন মাস্টার। সেই শব্দ শুনে ধীরে, অতি ধীরে পিছনে ঘুরলো তিয়াসা। তারপর টকটকে চোখ মেলে তাকালো ওদের দিকে। এরপর সেই অন্ধকার আকাশ আর মাঠের ব্যাকড্রপে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সীতেশের চোখের তারা নড়ছিল না সেই ভয়াল অবয়ব দেখে। তিয়াশার পেছনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে মা ভবানীর মন্দির। দুখু মিঞার জলা, হাড়মুড়মুড়ির জঙ্গল আর জঙ্গলের ধারে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় গজিয়ে ওঠা জবাগাছ। মাঠের সামনে সরু পথ ধরে এগিয়ে আসছে একটি বালিকামূর্তি যার হাতে ধরা জিনিসটা রাস্তার পাথরে লেগে এক ভীতিপ্রদ আওয়াজ তুলছে।

- ঠং, ঠং, ঠং। - ভয়ে যেন পাথর হয়ে যায় সীতেশ। পাশের মানুষগুলোকেও দেখতে

পায় না সে। চাপা অন্ধকারে ঢেকে দেয় সবকিছু। এতক্ষণে হাতে ধরা জিনিসটার আন্দাজ পায় সীতেশ। তাদের বড়ো কাটারিটা। তাহলে আজ আর খালিহাতে নয়; অস্ত্রহাতে শিকারে বেরিয়েছে ভবানীগঞ্জের পিশাচ। ঠিক এই-সময় চোখের সামনে হঠাৎ করে কুয়াশার একটা মিহি পর্দা নেমে আসে। খুব বেশিক্ষণ নয়, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। পর্দা সরে যেতে হতভম্ব সীতেশ দেখে জায়গাটায় সে একা। তার সামনে, পিছনে আর কিছু নেই। তিয়াসা উধাও। মাঠের দিকে আরো সরে এল সে। দু--একবার চাপাস্বরে নান্টু আর মাখন মাস্টারের নাম ধরে ডাকল। অন্ধকার হাওয়া যেন আশ-শ্যাওড়ার ঝোপে পাক খেয়ে খিলখিল করে হেসে বললো,-

- ‘কেউ নেই! কেউ নেই!’- আর ঠিক সেই সময় ব্যপারটা কানে এল তার। যখনই সে পা ফেলছে, মাঠে পড়ে থাকা শুকনো পাতার উপর, ঠিক তখনই আর একজনও পা ফেলছে একটু তফাতে। যেন সীতেশে পাতা মাড়িয়ে যাবার শব্দে লুকোতে চাইছে নিজের পা ফেলার শব্দ। সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে কে যেন অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করছে তাকে। প্রবল ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল সীতেশ। দরদর করে ঘামছে সে। তবু পূর্ব পরিকল্পনা মতো সে এগোতে লাগল মন্দিরের দিকে। মাঠের মাঝখানে একটা পাথর পড়ে। ছোটোবেলায় কতবার এই পাথরটাকে উইকেট বানিয়ে খেলেছে তারা। সেখানে বসে একটু জিরোতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে আকাশ বাতাস শিউরে দিয়ে কে যেন খোলা গলায় ডেকে উঠল,- ‘আয় রে আয়, আয় রে আয়……’। সেই ডাক শুনে বুকটা খালি হয়ে গেল সীতেশের। দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে দৌড়োতে লাগল মন্দিরের দিকে। তার পায়ে কাঁটার মতো ফুটতে লাগল পাথরকুচি। কিচ্ছু গ্রাহ্য করল না সে। পাগলের মতো ছুটতে লাগল। মনে

নেই কতক্ষণ পাগলের মতো দৌড়েছে সে, এমন সময় যেন হঠাৎ করেই মাঠটা শেষ হয়ে গেল তার সামনে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সীতেশ। সামনে মা ভবানীর মন্দির। কিন্তু মন্দিরের চাতালে ওটা কী? একদলা আঁধার যেন কীসের ওপরে ঝুঁকে বসেছিল তার দিকে পিছন ফিরে। সীতেশের পায়ের শব্দ শুনে সেই ঘোর কালো অন্ধকার ফিরে তাকালো তার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। লাল টকটকে জিভ বার করে একবার যেন ঠোঁট চেটে নিল সেই জমাট কালো অন্ধকার। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল সে। সেই অপার্থিব হাসি শুনে শরীরের প্রতিটি রক্তের ফোঁটা জমে গেল সীতেশের। হাতে পায়ে বল পেল না সে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল কার ওপর এতক্ষণ ঝুঁকে ছিল সেই অন্ধকারের পুঞ্জ। পুরোহিত শ্রী নরোত্তম ভটতাচার্যের জ্ঞানহীন শরীর। নরক থেকে উঠে আসা সাক্ষাৎ কালপিশাচটা তখন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছিল সীতেশের দিকে। তার মুখ থেকে রক্তের ফেনা উড়ে যাচ্ছিল আশেপাশের বাতাসে। সেই অমানুষিক ভয়াল বীভৎসতার সামনে এতক্ষণ জমিয়ে রাখা শেষ সাহসটুকু একেবারেই উড়ে গেল সীতেশের। তবু তার সামনে এই নরকের জীবটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না তার। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে! পালাতে গিয়েও পারল না। পড়ে গেল মন্দিরের সিঁড়িতে। এবার পিশাচটা তার বড়ো বড়ো হাতদুটো নামিয়ে আনলো সীতেশের কণ্ঠের উপর। নারকীয় দুটো হাতের বড়ো বড়ো বাঁকানো নখ সবে গলায় ফুটিয়ে তুলেছে শাণিত শোনিতের ধারা, চোখের সামনে ভয়াবহ মৃত্যু নেমে আসতে দেখে যখন প্রায় অজ্ঞান সীতেশ; এমন সময় মনে হল পিছন থেকে কে যেন মাথাটা টেনে ধরল সেই পিশাচের। তারপরে শুধু একটা জিনিসই দেখতে পেল সীতেশ, একটু উপর থেকে একটা বড় কাটারি নেমে এল নান্টুর গলায়। ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে গেল নান্টু পিশাচের। আর নিতে পারল না সীতেশের স্নায়ু। শুধু অজ্ঞান হতে হতে দু'চোখ বুজে আসার আগে সে দেখল একপাশে তখনও পড়ে আছে ধড়ফড় করতে থাকা নান্টুর কালো লোমশ লাশ, আর বাঁ হাতে সেই কাটা মাথাটা ধরে ডানহাতে চুঁইয়ে পড়া কাটারিটা টানতে টানতে মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের দিকে হেঁটে যাচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে তিয়াসা। মাখনবাবু অন্যপাশ থেকে দেখছিলেন গোটা ঘটনাটা। তাঁর অবস্থাও জীবন্মৃতের মত। চিত্ত বিকল- তার শেষ পর্যায়ে হঠাৎ তার খটকাটা মনে পড়ে গেল। টর্চের আলোয় পুকুড়পাড়ের রাস্তায় যে পায়ের ছাপ তিনি দেখেছিলেন সেই পা দুটির মধ্যমা নেই। তিনি জানেন – জন্ম থেকেই তিয়াসা তার দুটি পায়ে একটি করে আঙুল ছাড়াই জন্মেছে। তাঁর মনে পড়ল দ্বিজত্তম ভট্টাচার্যের কথা,-

- একমাত্র মা ভবতারিনীই পারেন আমাদের রক্ষা করতে'। ভোর হয়ে আসছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে নরোত্তম ভট্টাচার্য আবৃত্তি করছিলেন,-

"ন তাতো, ন মাতা, ন বন্ধুর্ণ, দাতা ন, পুত্রো ন, পুত্রী ন, ভৃত্যো ন ভর্তা;
ন জায়া, ন বিদ্যা, ন বৃত্তির্মমৈব, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেবা ভবানী।"

* * * *

গল্প

উত্তরের অপেক্ষায়

সুস্মিতা হালদার

(১)

— 'আচ্ছা মা, তুমি যে আমাকে খেলতে যেতে বারণ কর, তাহলে এখন যে ওই ভোটের জন্য সব লম্বা লম্বা মিছিল বার করছে, কই ওদের কেউ বকছে না। তাহলে আমাকে বকো কেন?'

একমুখ ভাত নিয়ে বকবক করে পাপিয়া। রোজ রাতে খেতে বসে হাজারো প্রশ্ন করে মাকে।

—'সে তো তুমি ছোট, তাই। করোনার সময় ছোটদের বাইরে বেরনো উচিত নয়। ওরা তো সব বড়, তাই ওদের কেউ কিছু বলে না। নাও মুখের খাবারটা শেষ কর তাড়াতাড়ি, তারপর কথা বলবে।' মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে মেয়ের সঙ্গে তাল মেলায় অনুরাধা।

ক্লাস সিক্সে পড়ে পাপিয়া। তবুও রোজ রাতের খাবারটা মায়ের হাতে খাওয়া চাই-ই চাই। অনুরাধা বকাবকি করতে পারে না। বাপহারা একরত্তি মেয়ে। মা ছাড়া আর কার কাছেই বা বায়না করবে?

—'মিথে কথা। এক্কেবারে মিথে কথা।' চোখ পাকায় পাপিয়া, 'করোনা তো বড়দের হয়। ওই মিছিলে যে বুড়োগুলো যায়, ওরকম বুড়োদের বেশি হয়। ছোটদের বিশেষ হয় না। আমি পড়েছি খবরের কাগজে। আর তুমি বল করোনা একটা দৈত্য। তুমি কিচ্ছু জানো না, ওটা দৈত্য নয়, ভাইরাস। ভাইরাস কাকে বলে আমি জানি। আমাদের লাইফ সায়েন্স ক্লাসে বলেছেন মিস।'

এক্কেবারে পাকা বুড়ি! ক্লাস ফাইভ থেকেই রোজ খবরের কাগজ পড়া চাই-ই চাই। ইংরেজি

কাগজগুলো পারে না। মেয়ের খবর পড়ার আর শোনার নেশা দেখে মা 'দ্য টেলিগ্রাফ' আর 'আনন্দবাজার' দুটোই রোজকার নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খরচা একটু হয় ঠিকই। কিন্তু কীই আর করা যায় ! খবরের কাগজ যত ছোট বয়েস থেকে পড়া যায় ততই ভাল। মাথা খোলে ভাল। মেয়েটার মাথায় বুদ্ধিটা দারুণ। বড় হয়ে উকিল হলে বেশ হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় অনুরাধার।

—'জানো মা, গত বছর যখন প্রথম লকডাউন হল, আমাদের ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। তখন একদিন চৈতি এসেছিল মনে আছে? ও পাড়ার চৈতি?'

—'হুঁ আছে। ওর বাবা কেমন রইল রে? আর খোঁজ নেওয়াও হয়নি।' ছোট্ট শ্বাস ফেলে

অনুরাধা।

—'চৈতির বাবা তো চায়ের দোকান দেয়। ওদের বাড়িতে টিভি নেই, ওরা জানত না এতশত। চায়ের দোকান রোজ যেমন দেয়, দিয়েছিল। তাতে একজন মহিলা এসে হুমকি দিয়ে ভিডিও করে নিয়ে যায়। ফেসবুকে ছেড়ে দেয়। পুলিশ এসে পরদিন ওর দোকানে চড়াও হয়। নিয়ম ভাঙার জন্য জরিমানাও করে। তারপর ফেসবুকের ওই ভিডিও দেখে নাকি অনেকে এসে ওকে নানা অপমান করে যেত। চৈতির কাছে শুনেছিলাম, ওর বাবা নাকি বলে, ওরা গরিব তাই ওদের মান অপমান থাকতে নেই। তাই লোকে এমন করে। আচ্ছা মা...'

পাপিয়ার এলোমেলো কথার মাঝে অনুরাধা আর এক গ্রাস মাছমাখা ভাত মুখে ঢুকিয়ে দেয়।

— 'আচ্ছা মা, তাহলে যে এই ভোটের জন্য সব দলগুলো মিছিল বের করল। বলছে খবরের কাগজে, এই মিছিলের ভিড় থেকে করোনা আরও বাড়ল। তাহলে ওদেরকে তো পুলিশ জরিমানা করছে না !'

—'ভোটটা জরুরি বাবা। জানিস তো, ইতিহাসে পড়িসনি, একটা দেশ গড়তে গেলে রাজা চাই। এখন তো আর রাজা নেই। সরকার দেশ--রাজ্য চালায়। সরকার গড়তে গেলে তো ভোট লাগবেই। তাই না?'

— 'মা, চৈতির বাবার যে ওই চায়ের দোকান টুকুই সব। ওখান থেকেই রোজকার হয়। তাহলে একদিন করোনার সময় বেশি চা বিক্রি করতে গিয়ে ভিড় যদি করেই ফেলে, এত দোষ? তার চাইতে কি বেশি ভিড় হয়না ওই মিছিলগুলোয়? তুমিও তো দেখিয়েছ আমাকে, কত লম্বা লম্বা মিছিল— কত লোক! করোনার সময় সরকার গড়তে কি এত লম্বা লম্বা মিছিল বের করতে হয়?'

সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না পাপিয়া। কিন্তু মেয়ের ছেঁড়া ছেঁড়া কথাগুলো শুনে চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় অনুরাধার।

—'এই... এসব কোত্থেকে শিখলি তুই?'

—'খবরের কাগজে পড়েছি।' টেবিলের কাঠের চোঙ খুঁটতে খুঁটতে খুব সাবলীল ভাবে উত্তর দেয় পাপিয়া।

—'এসব কথা একদম বলবি না আর কোনদিন। আমাকে যা বললে বললে। আর কারো কাছে বলো না। ছোটদের বলতে নেই এসব।'

—'কেন মা? বড়দের যা বলতে আছে ছোটদের তা বলতে নেই কেন?'

মেয়ের কথাগুলো যে বড় সত্যি। এইটুকু বয়সেই ছেলেবেলার রঙিন মুহূর্তের বদলে সে দেখতে শিখে গেছে কঠিন বাস্তব। কিন্তু বড় ভয় হয় অনুরাধার, মেয়ে যদি এসব বলে ফেলে কারো কাছে। তখন তো ওকে নিয়ে যে কী শুরু হবে ! এখন তো ছ'মাসের শিশুকে ধর্ষণ করতে ছাড়ে না জানোয়ারগুলো। সেখানে তার মেয়ে তো বারো বছরের। কিন্তু এ এত ফড়ফড়ি মেয়ে ! কী করে যে ওর মুখ থামানো যায় !

—'তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে উদ্ধার কর তো আমাকে। রান্নাঘরে সব বাসন পড়ে আছে। তারপর সেলাইয়ের অনেক কাজ আছে। চটপট কর। পরে কথা বলবি।'

(২)

মেয়েকে কোন রকমে খাইয়ে রান্নাঘরে বাসন ধুতে গেল। পাপিয়া পায়ে পায়ে যায় রান্নাঘরে। মায়ের নাইটি ধরে খুঁটতে থাকে।

—'সর এখান থেকে। গায়ে জল লেগে যাবে। আমি বাসন মেজে রান্নাঘর ধুয়ে যাব। তুই যা, দিদিমার কাছে গিয়ে বল চুলটা বেঁধে দিতে।'

— 'রোজই তো দিদা দেয়। আজ তুমি দাও না। দিদা টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেছে। ফোঁৎফুড়ড় করে নাক ডাকছে।'

উফফ, মায়ের এই রোগ! টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে বিল ওঠাবে। মনে মনে গজগজ করে অনুরাধা।

—'যা, টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে আয়। আর দিদিমাকে ঘরে দিয়ে আয় ধরে ধরে। ঘুম চোখে ঘরে যেতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খাবে।'

অপরেশ মারা যাবার পর থেকেই অনুরাধা বাপের বাড়িতে থাকে। মা-বাবার কাছে। অপরেশের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে। অপরেশের বাড়িতে ঠাঁই হয়নি অনুরাধার। এমন কি অপরেশও ত্যাজ্যপুত্র হয়ে আলাদা জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। সাধারণ একটা ফার্নিচারের দোকান ছিল অপরেশের। এখন তো সে দোকানও আর নেই। অপরেশের কথা মনে আসলেই অনুরাধা তা সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়ে দেয় মন থেকে। আবার রান্নাঘরের কাজে মন দেয়। অপরেশের মৃত্যুর পর শুধু শাঁখা সিঁদুর মুছেছে। বৈধব্যের আর কিছু পালে নি সে। রান্নাঘর পরিষ্কার করে শিকলটা টেনে দিয়ে বাথরুমে যায় অনুরাধা। গা-হাত পা ধুয়ে হলুদ-নোংরা মাখা নাইটিটা ছেড়ে অন্য একটা পরে নেয়।

—'দেখি, দে চুলটা বেঁধে দিই। ফিতে আর দড়ি নিয়ে আয়।'

চিরুনিটা নিয়ে মেয়ের কাছে বসে, খাটের ওপর পা দুটো মিলে।

—'কাল ক্লাস আছে?'

—'না। কাল তো শনিবার। ছুটি।'

মেয়ে শহরের একটা নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ওদের মত মধ্যবিত্তদের পক্ষে এরকম স্কুলের খরচা সামলানো কষ্টকরই। কিন্তু কীই বা করার আছে ! মেয়েকে ভাল করে পড়াশোনাটা তো শেখাতে হবে। আগে অনুরাধার সেলাইয়ের দোকান আর অপরেশের ফার্নিচারের দোকান থেকে যা আয় হত, কুলিয়ে যেত। এখন অপরেশের মৃত্যুর পর ফার্নিচারের দোকানটা বন্ধ হয়ে গিয়ে আর্থিক সংকটটা একটু বেশিই লাগছে। বাবার কাছে কতই আর হাত পাতা যায় নিজের আর মেয়ের জন্য। বাবা

মাকে তো কিছু দিতে পারে না । রান্নাবান্না বা গৃহস্থালি কাজের জন্য লোক রাখতে দেয়নি অনুরাধা। সে কাজগুলো নিজে করে বাবা-মার খরচটা অনেকটা পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কোভিড পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর পাপিয়াদের স্কুলে ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু হয়েছিল। কিন্তু আবার নতুন স্ট্রেনের দ্বিতীয় ঢেউ আসতেই স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। এখন অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। মেয়ের অনলাইন ক্লাসের জন্য একটা অ্যানড্রয়েড ফোন কিনে দিয়েছে অনুরাধা গত বছরই।

—'আচ্ছা মা, আমি পড়া না পারলে মিসরা বকেন। গার্জেন কলে ডেকে তোমাকেও কত কিছু বলেন।'

—'সে তো ভালর জন্য সোনা। তুমি লেখাপড়া করে কত বড় জায়গায় যাবে সেইজন্য।'

—'মা, তাহলে বড় জায়গায় গেলেই সবাই সব কিছু ঠিক বলতে পারে? কোন ভুল হয় না? সব জানে বড় জায়গায় যারা আছে, তারা? তাহলে সায়েন্টিস্টরা যারা এই ভ্যাক্সিন বের করল তারা তো বলে দেয়নি ভ্যাক্সিন নিয়ে লোক মারাও যেতে পারে। খবরে দেখেছ? ভ্যাক্সিন নেওয়ার পর কয়েকজন মারা গেছে। সায়েন্টিস্টরা তাহলে কী আবিষ্কার করল মা? ওরা তো অনেক বড় জায়গায় আছে। অনেক কিছু জানে। তাহলে ওদের কি কোন ভুল নেই আবিষ্কারে? আমি অঙ্ক পারি না। ইংলিশ গ্রামারে ভুল হয়। তার জন্য মিসরা কত বাজে বাজে কথা বলেন, বাবাকে টেনে। বলেন রেপিস্টের মেয়ে এর চেয়ে বেশি আর কী শিখবে! কিন্তু মা, আমার ভুলে তো লোক মারা যায় না। তাও আমাকে কথা শুনতে হয়? বকা খেতে হয়? তাহলে ওই সায়েন্টিস্টদের কেন কেউ বকে না? ওরা বড় বলে?'

অনুরাধা কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তিন বছর পরও মেয়েকে খোঁটা খেতে হয় 'রেপিস্ট'-এর মেয়ে তকমা দিয়ে। তাও শহরের নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে?

(৩)

তিন বছর আগে অনুরাধা আর অপরেশ যে ভাড়া বাড়িতে থাকত, সেই এলাকায় একটা ঘুপচি অন্ধকার গলির পিছনের মাঠে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। মুখটা এতটাই বিকৃত হয়ে গেছল ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়ার জন্য, যে চিনবার উপায় ছিল না। নির্জন জায়গায় ধর্ষণ হয়। কোন সাক্ষী ছিল না। যেদিন ধর্ষণ হয়, সেদিন রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। দোকান থেকে ফিরতে তাই মাঠ--লাগোয়া গলি রাস্তাটা ধরে অপরেশ। বর্ষা--বাদলা বা বেশি রাতে তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য এই রাস্তাটাই ধরে। সেদিন সাইকেলে ফিরতে ফিরতে দূর থেকে মনে হল মাঠের মধ্যে কেউ একটা পড়ে আছে। মানুষ। প্রথমে ভেবেছিল, কোন মাতাল মদ খেয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখতেই চমকে ওঠে। একটা মেয়ে — হাইটটা দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। পাপিয়ার মুখটা ভেসে ওঠে। অনুরাধাকে ফোন করে সাথে সাথে। পাপিয়া বাড়িতেই আছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়। ওখান থেকে খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে থানায় আসে। পুলিশকে সব বলে ডায়রি করে। এই পর্যন্তই জানত অনুরাধা। তারপর পুলিশ দু'তিনবার অপরেশকে থানায় নিয়ে গেছে। অনুরাধা জানত, জেরা করতে নিয়ে গেছে। অপরেশ প্রথম দেখেছিল বডিটা তার জন্য ওকে লাগছে ইনভেস্টিগেশনে। কিন্তু একদিন নিশুত রাতে একটা-দেড়টা নাগাদ পুলিশ আসে ওদের বাড়ি। ঘুম চোখে অনুরাধাই দরজা খোলে। দেখে পুলিশ। চোখের সামনে

ঘুমন্ত স্বামীকে হিড়হিড় করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ, মারতে মারতে। ওর কী দোষ, কিছুই বলে না পুলিশ। অনুরাধা বাধা দিতে গিয়েও শারীরিক বলে আটকাতে পারে না। পরদিন সকালে শোনে— স্বামী মারা গেছে— 'এনকাউণ্টার'-এ। ওদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছিল যখন, তখন ওই মাঠটা দিয়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। পুলিশ থামাতে গিয়েও পারে না। উল্টে নাকি পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে গুলি করতে যায়। তখনই পুলিশের গুলিতে মারা যায় অপরেশ। এমন গল্পটাই বলা হয়েছিল অনুরাধাকে। পাড়া-পড়শি, মিডিয়া এদের থেকে সে জেনেছিল, তার স্বামীই নাকি 'রেপ'টা করেছিল। বড় অদ্ভুত ঠেকেছিল, মানতে চায়নি অনুরাধা। সোশ্যাল মিডিয়াতে তার স্বামীর নামে নোংরা কথা চালাচালি হয়। অনেক পোস্ট পড়ে— পাপিয়াকেও ধর্ষণ করা হোক— এমন দাবি করে। ... কিন্তু প্রশ্নটা মনে এলেও তাকে বলতে দেওয়া হয় নি। একজন বাবা যখন অন্ধকারে দেখে একটা মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে, তা দেখে স্ত্রীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে নিজের মেয়ের কথা— তখন কী করে হতে পারে সে নিজে রেপ করেছে? রেপের পাশবিক ক্ষুধায় কি একটি বারের জন্যও তার মনে পড়ত মেয়ের কথা? অপরেশ যে পোশাকটা পরে সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোয় সেই পোশাকটা পরেই ফেরে, থানায় ডায়রি করে। পোশাকে কোন জল-কাদা-রক্ত কিছুরই দাগ ছিল না। এমনকি পরদিন অপরেশের জাঙ্গিয়া কাচতে গিয়েও কোন দাগ পায়নি অনুরাধা ! তাহলে কী করে সম্ভব এ সত্যি হওয়া? এই কি তবে আইন? বিনা বিচারে নিরপরাধকে মেরে ফেলা? কেন ওই পুলিশগুলোর কোন শাস্তি হল না? চাকরি গেল না? উল্টে প্রমোশন পেল? প্রমাণ কোথায় ছিল ওদের হাতে? যে অপরেশ কোনদিন অন্য কোন মহিলা সংসর্গে যায় নি, যার ফোন অবলীলায় দেখতে পেত অনুরাধা, কোনদিন কনডোমের প্যাকেট পর্যন্ত পায় নি অপরেশের ব্যাগে, পাপিয়া হওয়ার পর সেভাবে স্ত্রীর সঙ্গেও শারীরিক মেলামেশা করত না, মেয়ের চোখে পড়লে ভুল জিনিস শিখবে তার জন্য— এতটা রুচিশীল ভদ্র মানুষকে প্রমাণবিহীন ফৌজদারি দায়ে দোষী করলে কী করে তা মেনে নেওয়া সম্ভব? মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং থামতে যখন নিজের জন্য সময় পেল, তখন থেকে অনুরাধার মনেও সংশয় হয়— অপরেশ কি তাকে ঠকিয়েছে তাহলে? তার ভালবাসাকে? সত্যিই সে 'ধর্ষক'! কিন্তু সত্যিটা না জেনে ঘৃণাও করতে পারে না অনুরাধা তার ভালবাসার অপরেশকে। পুলিশ মেরে দিল কেন ওকে?

অপরেশের গায়ে এমন জোর নেই যে ও পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে নেবে— ও তো পিস্তল চালাতেই জানে না। নার্ভের রুগী অপরেশ। পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে পিস্তল টেনে নেওয়ার মত শারীরিক সক্ষমতা তার ছিল না। তবে কি এটা খুন? সারাটা জীবন একটা দগ্ধানো জ্বালার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হবে অনুরাধাকে— তার ভালবাসা কি সত্যি ঘৃণ্য 'ধর্ষক' নাকি তার বিরুদ্ধে এটা মিথ্যে ষড়যন্ত্র ছিল— হয়ত অন্য কোন বড় মুখ আড়াল করতে গিয়ে অপরেশের মত ছোট মানুষকে মেরে ফেলে পাবলিককে

শান্ত করা হল। হয়ত এর বেশি আর কিছুই না। কিন্তু ওই ঘটনাটাই অনেক বেশি হয়ে গেল ছোট্ট পাপিয়ার কাছে। ক্লাস থ্রি থেকেই ওর গায়ে তকমা লেগে গেল 'রেপিস্টের মেয়ে'। প্রথম প্রথম খুব কাঁদত পাপিয়া। একে বাবাকে হারিয়েছে। তাও আবার কিছুই বোঝে নি, কেন বাবা হঠাৎ চলে গেল। ভেবেছিল প্রথমে, বাবা ফিরে আসবে। মাস কয়েক যেতে বুঝল ধীরে ধীরে, বাবা আর ফিরবে না। সেই অবস্থায় স্কুলে নানা অপমান, টিচার-অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খারাপ ব্যবহার শিশু মনে প্রভাব ফেলেছিল অনেক। কয়েক মাস তো স্কুল যেতেই চাইত না। সেলাইয়ের দোকান ফেলে অনুরাধা যেতে পারত না। তার জন্য দিদিমা যেতেন সঙ্গে— মানে অনুরাধার মা— স্কুলের বাইরে বসে থাকতেন। এখন এই ছোট মেয়েরও 'রেপিস্টের মেয়ে' তকমাটা গা-সওয়া হয়ে গেছে— খারাপ ভাষাগুলোও বুঝে গেছে এটাই তার প্রাপ্য।

—'ও মা, কিছু বললে না আমার একটা প্রশ্নেরও।' পাপিয়ার হ্যাঁচকা টানে ঘোর কাটে অনুরাধার। 'রেপিস্টের মেয়ে' কথাটা শুনে পুরনো কথাগুলো এলোপাথাড়ি মনে পড়ছিল।

—'কী বলব বল? নে এবার শো। কাল সকালে উঠতে পারবি না। আমি মশারিটা টাঙিয়ে দিচ্ছি। শুয়ে পড়। আমি চট করে দেখে আসি তোর দাদু-দিদার কিছু লাগবে কিনা। দিয়ে তোর কাছে বসে সেলাইয়ের কাজ কটা করব।' মশারি টাঙাতে টাঙাতে বলতে থাকে অনুরাধা।

—'না, আগে আমাকে বলে যাও। কী যে সারাক্ষণ ভাবো! কতো কিছু বললাম। হুঁ হুঁ করে গেলে শুধু। শুনলে না কিছুই। একদম বুড়ি হয়ে গেছ তুমি। দিদার মতো।'

— 'কী? বল।' মৃদু হেসে মশারির ভেতর ঢোকে অনুরাধা, মেয়ের কাছ ঘেঁষে, 'সব শুনছি। তুই যেসব প্রশ্ন করিস, উত্তর পাই কোথা থেকে? পাকা বুড়ি একটা। মাকেও কথার প্যাঁচে হারায়। বল, কী বলবি?'

—'আমি ম্যাথস, ইংলিশ না পারলে মিসরা বকেন। খুব বকেন। আমার ভুল হলেই সবার সামনে বকেন। কিন্তু এই সায়েন্টিস্টরা যারা করোনার ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করলেন, ওঁদের ভাক্সিন নিয়ে তো বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। সেটা নিশ্চয় ওঁদের কিছু ভুল আছে, তার জন্যই তো। তাহলে ওঁদের তো কেউ বকে না। কিচ্ছু বলে না। আমার ভুলে তো মা মানুষ মরে না। তাও কেন দোষ পেতে হয় আমাকে? ওদের কেন পেতে হয় না?'

সাধারণ মেধার মা'কে এসব প্রশ্ন করলে তো একটাই উত্তর আসে— মনে মনে ভাবে অনুরাধা। কীই বা বলে সে? তার মত ছোট সাধারণ মানুষের কাছে এসবের কোন উত্তরই নেই। তাও মেয়েকে বুঝিয়ে বলে, চুলে বিলি কাটতে কাটতে।

—'তুমিও বড় হও একদিন, দেখবে আর কেউ কিচ্ছু বলবে না। কেউ দোষ দেবে না।'

—'বড় হওয়া কাকে বলে মা? তুমি কি বড় হওনি?'

—'বোকার মত প্রশ্ন করো না। শুয়ে পড়।' অনুরাধা উঠতে যায়। পাপিয়া মায়ের নাইটিটা শক্ত করে ধরে মুঠোর মধ্যে।

—'তুমি কি বড় না, মা? তার জন্য, মিসরা গার্জেন কলের সময় যখন আমাকে নিয়ে তোমায় বলেন, তখন তোমাকেও অপমান করেন? বকেন?... দোষ দেন?... কত বড় হলে মা, আর দোষ পেতে হয় না? অপমান- বকা এসব পেতে হয় না?'

ছোট গল্প

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ

সুমন চৌধুরি

মাংসটা না ঠিক মতো সিদ্ধ হয়নি। খাসির মাংস যদি এরকম হয় ..।

—তা যা বলেছো। ফ্রায়েড রাইসটা কীরকম চাল চাল। আর এটা রাধাবল্লভি? ঠান্ডা ঠান্ডা চামড়া যেন। উফফ।

অজিতবাবু এবং সুখেনবাবু তাঁদেরই নিকট আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। টেবিলের উল্টোদিকে বসেছে সৃষ্টি। সুখেনবাবুর মেয়ে। সে খাচ্ছে এবং চুপচাপ দুজনের মুখের কথা শুনছে। ইতিমধ্যে মেয়ের দাদা এলেন। টেবিলে টেবিলে গিয়ে ভদ্রতার খাতিরে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, 'রান্না ভাল হয়েছে তো দাদা?' একসময় এনাদের টেবিলেও এলেন। জিজ্ঞেস করলেন। হাসি মুখে উত্তর দিলেন সুখেন বাবু ,'হ্যাঁ বাবা। রান্না ভাল হয়েছে।

সৃষ্টি অবাক। এই লোকটা এতক্ষণ তো কত কথাই না বলছিল। সৃষ্টি খেয়াল করল, মুখে যতই বলুক না কেন, দুজনে কিন্তু বেশ পেট পুরে খাচ্ছে। ভাত থেকে ফ্রায়েড রাইস, খাসির মাংস থেকে শুরু করে ইলিশ মাছ। তারপর ফিশ ফ্রাই এবং আরও যা যা আছে। খাসির মাংস সিদ্ধ হয়নি বলে ছেড়ে দিচ্ছে তা নয়। বা ফ্রায়েড রাইস চাল চাল ভাব থাকায় যে খাচ্ছে না তা নয় কিন্তু।

সৃষ্টি ভাবছে, তবে মানুষ এত দুমুখো হয় কীভাবে? অবশেষে শেষ পাতে আই-সক্রিম এবং পান এল। সৃষ্টি সেগুলো হাতে নিয়ে হাত ধুতে চলে গেল। সৃষ্টির বয়স এখন বাইশ। কথা বার্তা চলছে। মানে পাত্রের খোঁজ চলছে। অবশেষে পাত্র পাওয়া গেল সৃষ্টির জন্য। খুব ভাল ছেলে। কলকাতায় থাকে। সম্ভ্রান্ত পরিবার। ঋষি। বড় ব্যবসা আছে নিজের।

ধীরে ধীরে সৃষ্টি আর ঋষির মেলামেশা বেড়ে উঠল। প্রতি সপ্তাহে দেখা করা, একে অপরকে গিফ্ট দেওয়া এসবের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রেম জমে উঠল তাদের। সৃষ্টি বুঝতে পারল, তার এবং ঋষির ভাবনা চিন্তা প্রায় একই প্রকারের। বিভিন্ন বিষয়ে দুজনের একই মত থাকে। বিয়ের দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সৃষ্টি কয়েকদিন ধরে যেন একটু চিন্তায় পড়েছে। ওর মা ভাবল, মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে, তাই হয়তো একটু চিন্তায়। কিছুদিন মেয়ের এরকম অবস্থা দেখে সুখেন-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মা তোর? 'সৃষ্টি একটু ভেবে বলল, 'বাবা, কোনও আত্মীয়কে আমার বিয়েতে ডেকো না প্লিজ।'

—মানে?

—আমি ঋষির সঙ্গে কথা বলেছি। ও ও রাজি। কোনও আত্মীয়কে ডেকো না। মন্দিরে বিয়ে করবো। আর তাতে খরচ কম হবে।

— তোকে খরচের চিন্তা করতে হবে না মা। তোর বাবা আছে তো ?

— বাবা, তোমার মেয়ের সব আবদার রেখেছো সবসময়। এরপর তো অন্য কারোর বউ হয়ে যাব। হ্যাঁ, তোমার মেয়ে থাকব অবশ্যই। কিন্তু তখন আমার ওপর আরও একজনের অধিকার জমবে। তার আগে এই একটা শেষ আবদার। যে টাকাটা বাঁচবে সেই টাকায় সেই দিন মন্দিরের সামনের

ওই গরিব মানুষগুলোকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দাও।

একটু ভেবে সুখেন বাবু বললেন,—আচ্ছা, তাই হোক। ভগবান জানে যে তুই আসলে কী চাস।

কথা মতো মন্দিরেই বিয়ে সম্পূর্ণ হল। মন্দিরের সমস্ত ভিখারি সেইদিন ভুরিভোজ সারলেন এবং দু হাত তুলে সৃষ্টি এবং ঋষিকে আশীর্বাদ করলেন। সৃষ্টি নিজে বিয়ের শেষে খাবার বেড়ে দিল। ঋষি হাত বাড়ালো। খাওয়ার শেষে সৃষ্টি এসে নিজের বাবাকে জিজ্ঞেস করল, এটাই ভাল। বলো বাবা?

—হ্যাঁ, সে ভাল। কিন্তু এরকম? আত্মীয়রা আসলেও বা কী হত?

সৃষ্টি হেসে বলল, তোমার সারা জীবনের আয় দিয়ে তুমি লোক খাওয়াবে আর ওরা এসে এক মুহূর্তে তোমার সমস্ত উপার্জনের একটা ইয়ার্কি বানিয়ে চলে যাবে। কেউ বলবে, —উহ। খাসির মাংসটা ঠিক সিদ্ধ হয়নি, বা রাধাবল্লভিটা একেবারে ঠান্ডা। তুমি বলতো বাবা, নিজের মেয়ের বিয়ের সময় এসব কথা যদি কানে আসে তখন কেমন লাগে? আর এমন নয় যে লোক খাবে না। খাবে। পেট পুরে খাবে আর তারপর এসব বলবে। তার থেকে বরং ওদের দেখো। ওই হাসিটাতেই যেন আমার বিয়ের সার্থকতা।

সুখেনবাবু একটু লজ্জা পেলেন বটে। কিন্তু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘কেন জানি না, আমার এখন ইচ্ছে করছে তোকে আজীবন আমার কাছে রেখে দিই। আগলে রাখি তোকে। কিন্তু বাবা তো। নিজের সুখের আগে মেয়ের সুখ দেখব। মন দিয়ে সংসার করিস মা। তোর শ্বশুর বাড়ি খুব ভাগ্যবান। তোর মতো একজন কে বউ হিসেবে পেয়েছে।’

বেঙ্গল টাইমসের বিভিন্ন সংখ্যায় এক বা একাধিক গল্প প্রকাশিত হচ্ছে।

চাইলে, আপনিও অণু গল্প বা ছোট গল্প পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

(a)

বেঙ্গল টাইমস

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

(c)

(d)

(e)

(f)

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in